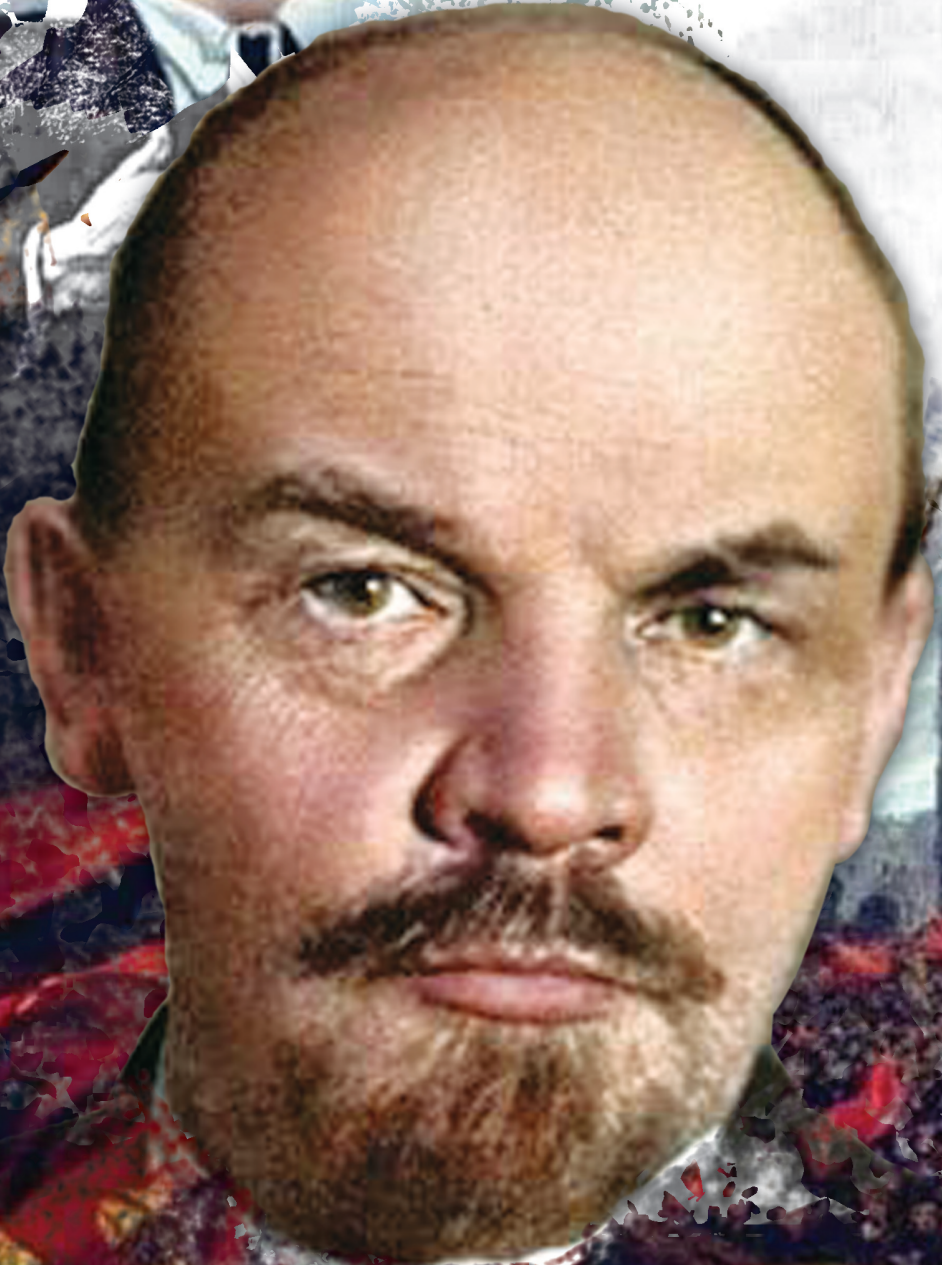


লেনিন ১৫০

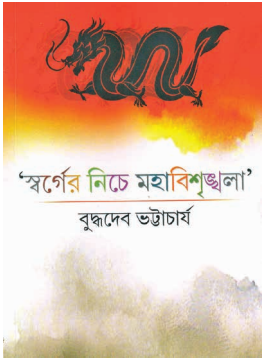
বিশেষ ডিজিটাল সংস্করণ

কবিলা

এপ্রিল-মে ২০২০

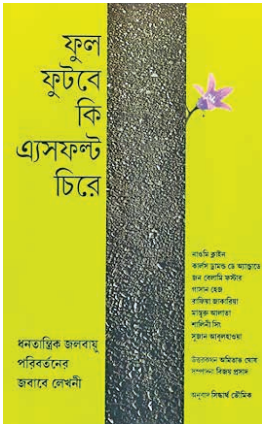


গল্প কবিতা লিটল ম্যাগাজিন বই



‘স্বর্গের নিচে মহাবিশ্বালা’
বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

আধুনিক চীনের ইতিহাস বিষয়ে সংক্ষিপ্ত অথচ তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ‘স্বর্গের নিচে মহাবিশ্বালা’
বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ৬০.০০

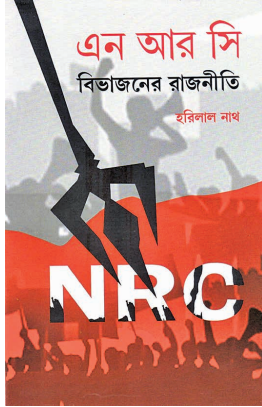


ফুল
ফুটবে
কি
অ্যাসফল্ট
চিরে

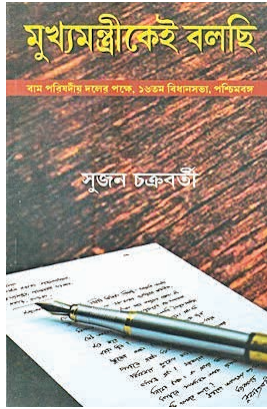
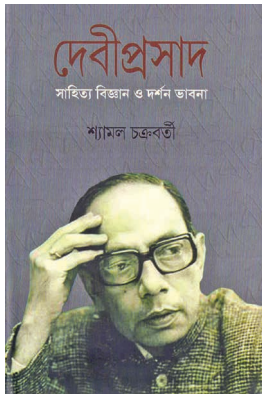
ধনতন্ত্রের কবল থেকে পরিবেশকে উদ্ধারের সংগ্রাম। বিশ্বের বিশিষ্ট লেখকদের লেখায় সমৃদ্ধ ফুল ফুটবে কি অ্যাসফল্ট চিরে (ধনতান্ত্রিক জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লেখনী)
সম্পাদনা : বিজয় প্রসাদ
৬০.০০

এন আর সি কি? এরফলে সমাজজীবনে অস্থিরতার কারণ বুঝতে

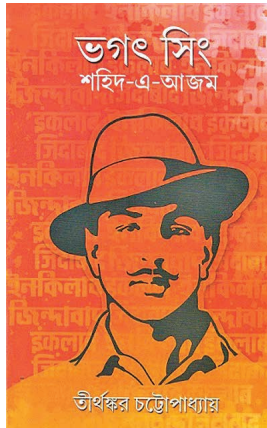
এন আর সি
বিভাজনের রাজনীতি
হরিলাল নাথ
দাম : ১৫ টাকা



দেবীপ্রসাদ : সাহিত্য, বিজ্ঞান ও দর্শন ভাবনা
শ্যামল চক্রবর্তী
৩৬০.০০

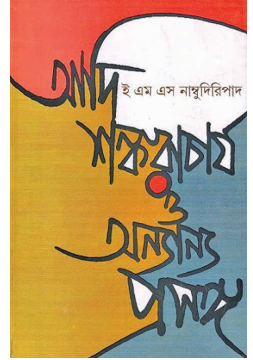


রাজ্যের জ্বলন্ত সমস্যা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে লেখা চিঠির সংকলন মুখ্যমন্ত্রীকেই বলছি
ড. সুজন চক্রবর্তী
৫০.০০

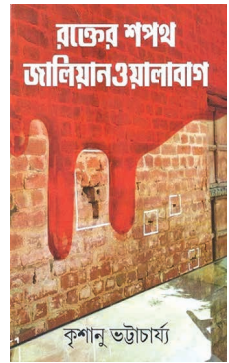


মহান বিপ্লবীর জীবন ও আদর্শ
ভগৎ সিং
শহীদ-এ-আজম
তীর্থঙ্কর চট্টোপাধ্যায়
৭০.০০

ধর্ম ও দর্শন বিষয়ক প্রবন্ধের সংকলন
আদি শঙ্করাচার্য ও অন্যান্য
প্রবন্ধ
ই এম এস নাথুদিরিপাদ
৫০.০০



রক্তের শপথ
জালিয়ানওয়ালাবাগ
কৃশানু ভট্টাচার্য ৭৫.০০



জল সংকটের তীব্রতা ও ব্যাপকতা বুঝতে জল নিয়ে যন্ত্রণা (প্রবন্ধ সংকলন) ৬০.০০



এন বি এ

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড

১২এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জি, কলকাতা-৭৩, (২২৪১-৬৪৩২)
● ২, সূর্য সেন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১২ (২২৪১-৩৩৭৬)
শাখা : বিধাননগর, শিলিগুড়ি, বর্ধমান, দুর্গাপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর
● e-mail : nba.pvlted@gmail.com ● Fax : 2334 2769

নেপল

৫৫বর্ষ • চতুর্থ-পঞ্চম সংখ্যা • এপ্রিল-মে ২০২০

লেনিন ১৫০

করোনার মধ্যে লেনিনপাঠ

তীর্থঙ্কর চট্টোপাধ্যায় ৭

লেনিন, রুশ বিপ্লব ও ভারত

দীপক নাগ ১০

শ্রীতিময় লেনিন

মানবশে ঠৌধুরি ১৬

গ্রামশির জেল ডায়েরি ও লেনিন

সত্যজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ২১

প্রবন্ধ

করোনা ভাইরাস এবং পুঁজিবাদের নিরাপত্তাহীনতা

সি পি চন্দ্রশেখর ৩৮

গল্প

বুলিবিবির উপাখ্যান চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায় ৩১

শ্রাবণের ঘর টোকন মান্না ৩৫

কবিতা

ব্রততী ঘোষরায় কনক ঠাকুর ঝাভু চট্টোপাধ্যায়

সোমনাথ রায় বিকাশ চন্দ্র মিঠু নাথ কর্মকার শ্রীনিবাস

অধিকারী সুমন চট্টোপাধ্যায় বিরূপাক্ষ পণ্ডা তন্দ্রা ভট্টাচার্য ৪১

লিটল ম্যাগাজিন সত্যজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৫

বই নিরন্ন কর্মহীন রাহুল মজুমদার ৪৭

প্রচ্ছদ : বিশ্বজিৎ আইচ

সম্পাদক : অনিরুদ্ধ চক্রবর্তী

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে অনিরুদ্ধ চক্রবর্তী কর্তৃক ৩১, আলিমুদ্দিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও গণশক্তি প্রিন্টার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৩৩, আলিমুদ্দিন স্ট্রিট কলকাতা ৭০০০১৬ থেকে তৎকর্তৃক মুদ্রিত।

ফোন : ২২১৭ ৬৬৩৩-৪০, ফ্যাক্স : ২২২৬৩৭৮৮ Web : www.nandanpatrika.com



সম্পাদকীয়

করোনা ভাইরাসের হঠাৎ আক্রমণে গোটা দুনিয়া লম্বভম্ব হয়ে যাওয়ার জোগাড়। সেখানে নন্দনের মত একটি পত্রিকার নিয়মিত সংখ্যা নির্দিষ্ট সময়ে প্রকাশ করা যে অসম্ভব তা বোধ করি পাঠকরা অনুভব করবেন। আমরা নন্দন এপ্রিল সংখ্যা ছাপতে পারিনি। ভেবেছিলাম হয়তো মে সংখ্যা পারব। কিন্তু সেটাও যখন সম্ভব হলো না তখন এপ্রিল-মে মিশিয়ে নন্দনের এই ডিজিটাল সংস্করণ তৈরি করা হলো। কবে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে কবে ছাপা নন্দন পাঠকের হাতে তুলে দেওয়া যাবে আন্দাজ করা যাচ্ছে না। তবে এটুকু বোঝা যাচ্ছে ভবিষ্যতে ডিজিটাল জগতেও নন্দনের উপস্থিতি প্রয়োজন। সাধ্যের মধ্যে পরিকল্পনা করেই তা বাস্তবায়িত করতে হবে।

করোনার আক্রমণ উদ্ভূত এই সংকট দেখা দিল এমন এক সময়ে যখন আমরা পরিকল্পনা করছিলাম কমরেড লেনিনের ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বেশ কিছু লেখা প্রকাশ করার। কিন্তু সবটা করা গেল না। আগামী দিনে তা সম্পন্ন করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

বিশ্বের সামনে মানুষের সামনে আজ যে ভয়াবহ দুর্দিন তার মোকাবিলা লেনিনের শিক্ষা কে বাদ দিয়ে হবে না। কারণ পৃথিবী কে বাঁচাতে সাম্রাজ্যবাদের চরিত্র বুঝতে পুঁজির শাসনের শাসনের অবসান ঘটাতে লেনিন আমাদের শিক্ষক।

আজ মুনাফার তাগিদে পুঁজিবাদ প্রকৃতির উপর নির্দয় অত্যাচার করেছে। এর অবসান প্রয়োজন। ক্রমশই এই বোধ জাগ্রত হচ্ছে। এটাই আশার কথা।

নন্দনের সকল পাঠক বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে আমাদের আবেদন এই দুর্দিনে নন্দন এর পাশে থাকুন। নন্দন পত্রিকা ও সীমিত সাধ্যের মধ্যে সর্বতোভাবে মানুষের পাশে থাকার অঙ্গীকার করেছে।

আপনারা সবাই সাবধানে থাকবেন। ভালো থাকবেন।



★ প্রতি সংখ্যা : ৩০ টাকা ★

- ★ অফিস থেকে সংগ্রহ করলে শারদ সংখ্যাসহ গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা ★
- ★ বার্ষিক (সডাক) শারদ সংখ্যাসহ গ্রাহক মূল্য ৫৫০ টাকা ★
- ★ কুরিয়ার মারফৎ রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় শারদ সংখ্যাসহ মোট বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৬০০ টাকা ★
- ★ ৫ কপি থেকে ৯৯ কপি পর্যন্ত শতকরা ২৫ টাকা কমিশন ★
- ★ তদুর্ধ্ব শতকরা ৩৩.৩৩% টাকা কমিশন ★

যোগাযোগ

নন্দন

৩৩, আলিমুদ্দিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৬

ফোন : ২২১৭ ৫৯২৯/২২৪৯ ১৬৬৮

বিজ্ঞাপন : ২২২৬ ৫৫০৭ (সময় : দুপুর ১২টা-৬টা)

ফ্যাক্স : ২২২৬ ৩৭৮৮

প্রাপ্তিস্থান

নন্দন কার্যালয়

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড

(কলেজ স্ট্রিট, বিধাননগর, বর্ধমান, দুর্গাপুর, মেদিনীপুর, শিলিগুড়ি)



করোনার মধ্যে লেনিনপাঠ

তীর্থঙ্কর চট্টোপাধ্যায়



১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লব সফল হবার সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী ইঙ্গ-ফরাসি-মার্কিন শিবির তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রচার শুরু করে। শুধু প্রচারাভিযানে তারা নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখেনি। প্রথম মহাযুদ্ধ (১৯১৪-১৯) শেষ হবার পর তারা একযোগে সামরিক অভিযান চালায় নবগঠিত বলশেভিক প্রজাতন্ত্রের উপর। লালফৌজের কাছে অপ্রত্যাশিত প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়ে ফ্রান্স ও আমেরিকা শীঘ্রই নিরস্ত হয়, কিন্তু ব্রিটেন দীর্ঘকাল আক্রমণ জারি রেখেছিল; সহায়তা পেয়েছিল বিশ্বাসঘাতক কোলচাক-দেনিকিনদের অনুগামী তথাকথিত স্বেতরক্ষীদের কাছ থেকে। দু'বছর বাদে সাম্রাজ্যবাদীরা ও বিশ্বাসঘাতকরা সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত হয়।

অতএব অক্টোবর বিপ্লবের পর থেকে লেনিনকে যুগপৎ

তিন ধরনের নেতৃত্বে ব্রতী থাকতে হয়েছিল। প্রথমত, সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের মূল পদ্ধতিগুলি সম্পর্কে পার্টিকে এবং দেশকে সচেতন ও সক্রিয় রাখতে হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, শত্রুর আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ও প্রতি-আক্রমণের উপযুক্ত সৈন্যবাহিনী ও সমরসম্ভার মজুত করে দেশকে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করতে হয়েছিল। তৃতীয়ত, দেশে ও বিদেশে বলশেভিকদের বিরুদ্ধে ও মার্কসবাদের বিরুদ্ধে যে কুৎসার বন্যা বয়ে যাচ্ছিল, তার জবাবে একের পর এক কমিউনিস্টদের তাত্ত্বিক অবস্থান ব্যাখ্যা ও প্রচার করতে হচ্ছিল।

শত্রুদের একটি বহুল প্রচারিত কথা ছিল, নবগঠিত সোভিয়েত রাশিয়ায় না আছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, না আছে সমানাধিকার। সেখানে গণতন্ত্রের লেশমাত্র নেই।

লোক-ঠকানোর এই অপকৌশলের প্রতিবাদ করে একটি সম্মেলনে লেনিন তাঁর বক্তব্য পেশ করেন ১৯১৯-এর মে মাসে। সেই বছরেই ওই বক্তৃতা পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। স্বাধীনতার প্রশ্ন এবং সমানাধিকারের প্রশ্ন, দুটিরই বিশদ জবাব লেনিন সেই রচনায় দিয়েছিলেন। স্বাধীনতার প্রশ্নকে, লেনিন লিখলেন, কমিউনিস্টরা অবশ্যই গুরুত্ব দেয়। জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সময়ে এই বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছিল, কারণ তখন দরিদ্র মানুষের অধিকার ছিল না জমি বা রুটির দাবি তোলার; তুললে জেলখানায় পচতে হত। সুতরাং পরিষ্কার করে বুঝে নিতে হবে, স্বাধীনতা কার জন্য? বিপ্লবের পরে যে শ্রমিক-রাষ্ট্র গঠিত হয়েছে, তা ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান ঘটিয়েছে। সমস্ত জমি ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি এখন রাষ্ট্রের। তা ব্যবহৃত হচ্ছে তাদেরই স্বার্থে, যারা এতকাল শোষিত ও বঞ্চিত ছিল। যারা এই রাষ্ট্রকে আক্রমণ করেছে এবং যে ঘরশত্রু কোলচাকরা তাদের মদত জোগাচ্ছে, তাদের লক্ষ্য ব্যক্তিগত মালিকানা ফিরিয়ে আনা এবং ফের শোষণ কায়ম করা। কমিউনিস্টরা পরিষ্কার জানিয়ে দিতে চায়, শত্রুদের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নেই, কারণ সেই মতপ্রকাশের লক্ষ্য হচ্ছে অত্যাচার ও বঞ্চনার প্রত্যাবর্তন। কমিউনিস্টরা পরিষ্কার কথা বলতে ভালোবাসে। “ব্রিটিশ, ফরাসি ও আমেরিকান ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা যে স্বাধীনতার কথা প্রচার করেন, তা যদি পুঁজির জোয়াল থেকে শ্রমের মুক্তির বিরুদ্ধে যায়, তবে তা প্রবঞ্চনা। হে সভ্য ভদ্রবৃন্দ, আপনার একটি অনুপঞ্জের কথা ভুলে গেছেন। আপনারা ভুলে গেছেন যে আপনাদের স্বাধীনতা এমন একটি সংবিধানে বিধৃত, যে সংবিধান ব্যক্তিগত মালিকানাকে অনুমোদন করে। গোটা বিষয় হল এটাই।” (লেনিন রচনাবলী, খণ্ড ২৯, পৃষ্ঠা ৩৫৩)।

জমায়েতের অধিকার, সভাসমিতি করার অধিকার যদি পুঁজিবাদীদের দেওয়া যায়, তবে তা শ্রমজীবী মানুষের বিরুদ্ধে জঘণ্য অপরাধ হবে বলে লেনিন ঘোষণা করলেন। তা হবে প্রতিবিপ্লবীদের জমায়েতের অধিকার। ১৬৪৯ সালে যখন ইংল্যান্ডে বুর্জোয়া বিপ্লব হয়, তারা কি রাজতন্ত্রীদের জড়ো হতে দিত? ফরাসি বিপ্লবের সময়ে বিপ্লবীরা বুঁবদের প্রত্যাবর্তনের পক্ষে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা দিত নাকি? প্রতিবিপ্লবীদের কোনো সুযোগ সুবিধা দেওয়া যাবে না, কারণ তাদের বিরুদ্ধেই লড়াই, তাদের বিরুদ্ধেই প্রতিরোধ। শ্রমিকশ্রেণির একনায়কত্বের অর্থই হল লড়াই করতে শ্রমিকশ্রেণি অগ্রসর। “মার্কসবাদ, যা শ্রেণিসংগ্রামের প্রয়োজনকে স্বীকৃতি দেয়, এ কথা দৃঢ়ভাবে বলে যে মানবজাতি সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে কেবল শ্রমিকশ্রেণির একনায়কত্বের মাধ্যমে। একনায়কত্ব কথাটা নিষ্ঠুর, কঠোর, রক্তাক্ত এবং যন্ত্রণাদায়ক; কথাটা খেলাচ্ছলে ব্যবহার করা যাবে না। সমাজতন্ত্রীরা এই স্লোগান সামনে রাখে, কারণ তারা জানে যে শোষণকারীরা প্রাণপণ এবং নিরস্তর লড়াই-এর পরেই কেবল নতিস্বীকার করবে এবং তারা সবরকমের বড় বড় কথা দিয়ে নিজেদের শাসনকে আড়াল করার চেষ্টা করবে।”

অতএব অক্টোবর বিপ্লবেই কাজের সমাপ্তি নয়। বুর্জোয়াদের

জড়িয়ে শ্রমিকশ্রেণি রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেছে বলেই যে বুর্জোয়ারা হাল ছেড়ে দিয়েছে তা নয়। বরং শ্রেণিসংগ্রাম তীব্রতর হয়েছে। লেনিন দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে বলছেন সুইটজারল্যান্ডের দিকে, যেখানে প্রতিটি বুর্জোয়া হাতে তুলে নিচ্ছে অস্ত্র; কারণ তারা জানে, মজুরি-দাসত্বে লক্ষ লক্ষ মানুষকে আবদ্ধ রাখতে গেলে কেবল অস্ত্রের দ্বারাই নিজেদের প্রতিপত্তি বজায় রাখতে হবে। লড়াই শুধু রাশিয়ায় সীমাবদ্ধ নয়, লড়াই এখন বিশ্বব্যাপী। কাজেই যে এখনও (অর্থাৎ ১৯১৯ সালেও) “গণতন্ত্র” বা “স্বাধীনতা” প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করছে, সে বুঝতে পারছে না যে এতদিন অবধি গণতন্ত্র আর স্বাধীনতা ছিল কেবল বিভবান শ্রেণির গণতন্ত্র, কেবল বিভবানের স্বাধীনতা আর বাকিদের জন্য খুদকুঁড়ো। ও কথাগুলো ব্যবহার করা কেবল মানুষকে ঠকানোর জন্য।

প্রবন্ধের পরবর্তী অংশে লেনিন সমতা বা ইকোয়ালিটি নামক বহু ব্যবহৃত শব্দটি নিয়ে বুর্জোয়া প্রচারের বিরোধিতা করেছেন মার্কসীয় তত্ত্বের পটভূমিকায়। সাম্রাজ্যবাদীরা ও তাদের দালালরা প্রচার করছিল, কমিউনিস্টরা সব নাগরিকদের সমান অধিকার দিচ্ছে না। শ্রমিকের যে অধিকার আছে, সকলের সে অধিকার নেই। বুর্জোয়ারা তো শাসন ক্ষমতায় নেই আর। এখন সকলকে সমান অধিকার দিতে অসুবিধা কোথায়?

লেনিন লিখলেন, বিপ্লবীরা সমতা বা ইকোয়ালিটি বলতে কী বোঝে, সেটা উপলব্ধি করা দরকার। বিপ্লব একের পর এক শাসকশ্রেণির কর্তৃত্বের অবসান ঘটিয়েছে। প্রথমে ঘটল রাজতন্ত্রের অবসান; রাজা-প্রজার ভেদ লুপ্ত করাই ছিল উদ্দেশ্য। তারপরে বিপ্লবীরা সামন্ত-প্রভুদের ক্ষমতা কেড়ে নিল; যার জমি নেই, আর যার অনেক জমি আছে, তাদের তফাত না রাখাই ছিল উদ্দেশ্য। এই দুটি উদ্দেশ্য, এই দুটি স্লোগান নিয়ে ফরাসি বিপ্লব এগিয়েছিল। কিন্তু বিপ্লব আরও বিকশিত হল। এবার ধনি উঠল, শ্রমিকের কাঁধ থেকে পুঁজিবাদের জোয়াল নামাতে হবে, তা না হলে সব মানুষের সমানাধিকার আসবে না। যতক্ষণ ব্যক্তিগত মালিকানা রয়েছে, ততক্ষণ সমানাধিকারের কথা বলা মানে মানুষকে ঠকানো। উৎপাদনের উপকরণ যখন ব্যক্তি মালিকানাধীন, পুঁজি অর্থাৎ টাকাকড়ি রয়েছে মালিকের পকেটে, ততক্ষণ শ্রমিককে মালিকের মতোই একটি ভোটের অধিকার দেওয়ার অর্থ হল গণতন্ত্রের নামে তঞ্চকতা। সত্য কথা, বিপ্লবের ফলে বড়লোকদের বাড়ি এবং বৃহদাকার ভূসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়েছে। অল্প কিছুদিনের চেষ্টায় উৎপাদনের উপকরণও রাষ্ট্রায়ত্ত্ব করা সম্ভব, পুঁজিও বাজেয়াপ্ত করা সম্ভব। কিন্তু অর্থ, টাকাকড়ি? তার বিলুপ্তি কি সম্ভব?

“অর্থ হল জমাট সামাজিক সম্পদ, জমাট সামাজিক শ্রম। অর্থ হল সেই অভিজ্ঞান যা দেখিয়ে অর্থের মালিক সমস্ত খেটে-খাওয়া মানুষের কাছ থেকে নজরানা আদায় করতে পারে। অতীতের শোষণের অবশেষ হল অর্থ। এই হল অর্থ। তাকে কি এক ধাক্কায় বিলুপ্ত করা সম্ভব? না। ...আমরা বলি যে টাকাকড়ি আপাতত থাকবে, বেশ দীর্ঘকাল ধরেই থাকবে, যতদিন পুরোনো পুঁজিবাদী



ব্যবস্থা থেকে নতুন সমাজবাদী ব্যবস্থায় উত্তরণের পর্ব চলবে, ততদিন।” (রচনাবলী ২৯, পৃষ্ঠা ৩৫৮)।

অর্থাৎ, লেনিন বলছেন, যতদিন টাকা বা অর্থ থাকছে, ততদিন তার ব্যক্তিগত মালিকানা থাকছে এবং শ্রেণিও থাকছে। শ্রেণিভেদের অবলুপ্তি আর অর্থের অবলুপ্তি অন্যান্যনির্ভর। যতদিন তা না ঘটছে ততদিন সকলের সমান অধিকারের কথা বলা মানে শোষণের অবশেষকে অস্বীকার করা, শ্রেণিভেদ থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকা। নিজের কথার সমর্থনে লেনিন স্মরণ করছেন এঙ্গেলসের সেই কথা যা উচ্চারিত হয়েছিল অ্যান্টি-ডুয়েরিং গ্রন্থে। “শ্রেণিসমূহের অবলোপনের কথা মাথায় না রেখে সমানাধিকারের ধারণা করা এক অর্থহীন নির্বোধ কুসংস্কার, এঙ্গেলসের এই কথা হাজার বার সত্য।”

২০২০ সালের বাইশে এপ্রিল লেনিন-জন্মের দেড়শো বছর পূর্তি উদ্‌যাপন দুনিয়াজোড়া এক বিরাট সংকটের মধ্যেই ঘটছে। করোনা ভাইরাসের বিশ্বব্যাপী আক্রমণ এ পর্যন্ত আড়াই লক্ষের বেশি মানুষের প্রাণ নিয়েছে; আগামী কয়েক সপ্তাহে এই সংখ্যার ভয়াবহ বৃদ্ধির আশঙ্কা দূর হয়নি। সারা ভারত অশেষ কষ্ট স্বীকার করে করোনার বিরুদ্ধে লড়ছে, প্রচুর স্বার্থত্যাগ করেই লড়াই জারি রাখতে হচ্ছে বেশিরভাগ মানুষকে। আর ভারতের শাসকশ্রেণি এই মুহূর্তটিকে বেছে নিয়েছে শ্রমিকের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য। শ্রমিকরা যেন ভারতের নাগরিক নয়, বিশেষত পরিযায়ী শ্রমিকরা এবং আদিবাসী শ্রমিকরা। মালিকের ব্যবস্থা বন্ধ; সে কোনো দায়িত্ব নেবে না। সে ক্ষেত্রে সরকারের দায়িত্ব নেবার কথা; কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকার সামান্যতম রেশনের ব্যবস্থা করবে না। দেড় মাসের ওপর ট্রেন

চলেনি, বাস চলেনি। পরিযায়ী শ্রমিকরা তাদের সুদূর কর্মস্থল থেকে নিজের বাসস্থানে ফিরবার জন্য হাটা ছাড়া কোনো উপায় দেখেননি। করোনায় মরার আগেই পাছে অনাহারে মরতে হয়, তাই দলে দলে তাঁরা পথে বেরিয়ে পড়েছেন। রাস্তা ধরে চলেছেন, দ্রুত-ধাবমান লরি থাক্কা দিয়ে মেরে ফেলেছে। রেল-লাইন ধরে চলেছেন, বিশ্রাম নিতে বসেছেন, মালগাড়ি এসে পিষে দিয়ে গেছে বাদনাপুর আর কারমাদ স্টেশনের মধ্যে, লাইনের ওপর ছড়িয়ে আছে কষ্টার্জিত রুটি, যে রুটির জন্য তাঁরা ঘর ছেড়ে অন্য রাজ্যে গিয়েছিলেন। বারো বছর বয়সের আদিবাসী মেয়ে জামলো তেলেঙ্গানা থেকে হেঁটে ফিরছিল ছত্তিশগড়ে, সঙ্গে খাবার নেই, তৃষ্ণার জল নেই; নিজের গ্রাম যখন আর কয়েক কিলোমিটার দূরে তখন অবশেষে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় প্রাণ গেল। রাষ্ট্র নিরঙ্কুশ; রবিবারের মনের কথা অব্যাহত এবং লজ্জাহীন। দুর্দিন, অতএব সবচেয়ে ধনীদেবের আয়করের ৬৮ হাজার কোটি টাকা মাপ হয়। শ্রমিকের ঘরে ফেরার রেলভাড়া দেবার সময়ে হঠাৎ অর্থাভাব হয় কেন্দ্রের আর রাজ্যের, দর কষাকষি চলে দুজনের মধ্যে।

এটাই হবার কথা। যতই কেন না গণতন্ত্রে প্রত্যেকের একটা ভোট থাকুক, রাষ্ট্র ক্ষমতার মালিক বৃহৎ বুর্জোয়ারা আর তাদের বংশবদ ভৃত্যরা। তাদের হিসেবে সব অধিকার আমবানির, জামলোর এক বোতল জল পাবার অধিকারও নেই। এই হল বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সমানাধিকার। শ্রমিকের আছে কেবল মরার স্বাধীনতা, করোনায় বা অনাহারে। স্বাধীনতা আর সমতা সম্পর্কে ১০১ বছর আগে লেনিন যা লিখেছিলেন, ভারতের আজকের অভিজ্ঞতায় তা অক্ষরে অক্ষরে খাটে।



লেনিন, রুশ বিপ্লব ও ভারত

দীপক নাগ



“চির জাগরুক লেনিনের আহ্বান :

শ্রমিক,

শেষ আঘাতের জন্য তৈরি হও।

ক্রীতদাসেরা,

নতজানু নয়

শিড়দাঁড়া সোজা কর!

সর্বহারা সেনাদল!

জাগো তোমাদের সর্বশক্তি নিয়ে!”

– মায়াকোভস্কি

১৮৫৩ সালে কার্ল মার্কস নিউ ইয়র্ক ডেইলি ট্রিবিউন পত্রিকায় প্রকাশিত ‘ভারতে ব্রিটিশ শাসন’ নামক প্রবন্ধে বলেন : “হিন্দুস্তান যেন এশীয় আয়তনের এক ইতালি, হিমালয় তাঁর আল্পস, বাংলার সমভূমি যেন তার সিসিলি দ্বীপ। জমির উৎপন্নের সেই একই সমৃদ্ধ বৈচিত্র্য এবং রাজনৈতিক চেহারায সেই একই খণ্ড খণ্ড

ভাব ... তবু সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে দেখলে ইতালি নয়, হিন্দুস্তান হলো প্রাচ্যের আয়ারল্যান্ড।” ওই একই প্রবন্ধে তিনি উল্লেখ করেন, “যেন না ভুলি যে এই হীন, অনড় ও উদ্ভিদসুলভ জীবন, এই নিষ্ক্রিয় ধরনের অস্তিত্ব থেকে অন্যদিকে, তার পালটা হিসাবে তৈরি হয়েছে বন্য লক্ষ্যহীন এক অপরিসীম ধ্বংসশক্তি আর হত্যা ব্যাপারটাই হিন্দুস্তানে পরিণত হয়েছে এক ধর্মীয় প্রথায়। যেন না ভুলি যে ছোটো ছোটো এই সব গোষ্ঠী ছিল জাতিভেদ প্রথা ও ক্রীতদাসত্ব দ্বারা কলুষিত। অবস্থার প্রভুরূপে মানুষকে উন্নত না করে তাকে করেছে বাইরের অবস্থার অধীন, স্বয়ং বিকশিত একটি সমাজ ব্যবস্থাকে তারা পরিণত করেছে অপরিবর্তনীয় প্রাকৃতিক নিয়তিরূপে এবং এইভাবে আমদানি করেছে প্রাকৃতিক পশুবৎ পূজো, প্রকৃতির প্রভু যে মানুষ তাকে হনুমানদের রূপী বানর এবং সবলাদেবী রূপী গোরুর অর্চনায় ভুলুপ্তিত

করে তার অধঃপতনের প্রমাণ দিয়েছে।” ১৮৪৮ সালে মার্কস-এঙ্গেলস তাঁদের কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহার রচনার সময় থেকেই ভারত সম্বন্ধে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

মার্কস বা এঙ্গেলসের মতো রাশিয়ার নভেম্বর বিপ্লবের প্রমাণ সৈনিক ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিনও তাঁর রাজনৈতিক জীবনের প্রথম থেকেই ভারত সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহ দেখিয়েছেন। ১৮৯৮ সালে রাশিয়ার কয়েকটি সোশ্যালিস্ট পার্টিতে একত্রিত করে লেনিন গড়ে তুললেন রুশ সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক লেবার পার্টি বা সংক্ষেপে আর এস ডি এল পি। রাশিয়ার মতো একটা কৃষিপ্রধান দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্ভব কিনা তা নিয়ে বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক দল, বিশেষ করে নারদনিকদের মধ্যে নানা তর্কবিতর্ক ছিল। রাশিয়ায় পুঁজিবাদী বিকাশ ঘটেছে কিনা তা নিয়েও মতপার্থক্য ছিল। মাত্র আঠাশ বছরের যুবক লেনিনের মত ছিল আলাদা। গভীর অধ্যয়নের মাধ্যমে তিনি এই সিদ্ধান্তে এলেন যে, রাশিয়া তার পিছিয়ে পড়া সামন্ততান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কাটিয়ে উঠে পুঁজিবাদী বিকাশের দিকে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। পুঁজিবাদী অগ্রগতির বিষয়ে লেনিন ভারত ও রাশিয়াকে একই পর্যায়ভুক্ত হিসাবে উল্লেখ করেন^২।

নভেম্বর বিপ্লবে নেতৃত্ব দেওয়া ছাড়াও মার্কসবাদে লেনিন। মৌলিক অবদান রেখেছেন। স্ট্যালিন সঠিকভাবেই সেই অবদানকে ‘লেনিনবাদ’ হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। চিঠিপত্র ইত্যাদি সব মিলিয়ে তাঁর সংগৃহীত রচনাবলির সংখ্যা ৪৫ খণ্ড। এর মধ্যে অন্তত ২৫ খণ্ডই কোথাও না কোথাও ভারত প্রসঙ্গ এসেছে। লেনিনের সংগ্রহে ভারত সম্পর্কে বইয়ের সংখ্যা ছিল ২৮^৩। কিছু ক্ষেত্রে লেনিন ভারত সম্বন্ধে মার্কস বা এঙ্গেলসের মতামত উল্লেখ করে নিজের বক্তব্য স্পষ্ট করেছেন। মার্কস বা এঙ্গেলসের মতো লেনিন ভারত সম্বন্ধে বড়ো কোনও প্রবন্ধ রচনা করেননি। জীবনের বেশ কিছুটা সময় তাঁকে সাইবেরিয়ার মতো জায়গায় নির্বাসনে কাটাতে হয়েছে। ফলে সঠিক তথ্যের অভাবের জন্য তিনি ভারত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করার সুযোগ পাননি। লেনিন ভারত সম্বন্ধে মার্কস-এঙ্গেলসের বক্তব্যকে প্রসারিত করেছেন।

পুঁজিবাদী দেশগুলো কিভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল বা তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে পড়া দেশগুলোর ওপর শোষণ ও অত্যাচার চালায় নানা লেখায় লেনিন তা প্রকাশ করেছেন। এক্ষেত্রে লেনিন উদাহরণ হিসাবে ভারতের ওপর চতুর ইংরেজদের লুণ্ঠেরা চরিত্রের কথা বলেন। সমাজতন্ত্রীদের বক্তব্য প্রচার করার জন্য লেনিন ১৯০০ সালের ডিসেম্বরে ইসক্রা বা স্ফুলিঙ্গ নামে একটি রাজনৈতিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। আর এস ডি এল পি-র মুখপত্র হিসাবে ইসক্রা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এর প্রথম সংখ্যাতেই লেনিন ‘চিনে যুদ্ধ’ নামে এক প্রবন্ধে ভারতের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেন, “খুব তাড়াতাড়ি বাড়তে থাকা পুঁজিবাদী শিল্পের প্রতিটি দেশই অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে উপনিবেশ তৈরি করার মতো দেশ খুঁজে বেড়াচ্ছে। বা বলা যেতে পারে এমন দেশ তারা চায় যার শিল্পবিকাশ খুবই দুর্বল, যেখানে কমবেশি পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা এখনও চালু আছে

এবং যেখানে কলকারখানার মাধ্যমে তৈরি জিনিসের একটা বাজার আছে আর সেইসব জিনিস বিক্রি করে প্রচুর পরিমাণ লাভ করা যায়। হাতে গোনা কয়েকজন পুঁজিপতির লাভের অঙ্ক বাড়বার জন্য বুর্জোয়া সরকারগুলো অসংখ্য যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছে। তারা অস্বাস্থ্যকর গরমের দেশগুলোতে সেনা পাঠিয়ে তাদের মরণের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এইসব সরকার সাধারণ মানুষের কাছ থেকে জোর করে আদায় করা কোটি কোটি টাকা নয়ছয় করছে। উপনিবেশের জনগণকে তারা ঠেলে দিচ্ছে মরিয়া বিদ্রোহ ও না খেয়ে মরার দিকে। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের মরিয়া বিদ্রোহ এবং ভারতের দুর্ভিক্ষ কিংবা বুয়রদের বিরুদ্ধে ইংরেজদের বর্তমান যুদ্ধ আমাদের মনে রাখা উচিত”^৪।

পুঁজিবাদী দুনিয়ার যাতাকলে পড়ে ভারতের সামাজিক অবস্থার মধ্যে দোটানা ভাবটাও লেনিনের দৃষ্টি এড়ায়নি। কাঁচামালের উৎস হিসাবে ভারতের বিশেষ স্থানের কথা মার্কস-এঙ্গেলসের মতো লেনিনও উল্লেখ করেছেন। পুঁজিবাদী বিশ্ববাণিজ্যে উপনিবেশিক দেশগুলোর প্রতি আকর্ষণ ক্রমাগত বেড়ে চলায় এবং তার ফলে সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কের ভাঙন ক্রমাগত বেড়ে চললেও এই উৎপাদন ব্যবস্থায় যে ধরনের কলকারখানা ভিত্তিক শিল্প গড়ে ওঠা উচিত ছিল, তা কিন্তু উপনিবেশগুলোতে উনিশ শতকের প্রায় শেষ স্তরে এসেও দেখা যায়নি। লেনিনের মতে, ‘কেবল ভারত এবং সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলগুলো বিশ্ববাজারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল’^৫।

রাশিয়ায় পুঁজিবাদী বিকাশ সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে লেনিন তাঁর বিভিন্ন রচনায় ভারতের প্রসঙ্গ তুলেছেন। লেনিন বিশেষ করে লক্ষ্য করেন যে, মার্কস-এঙ্গেলস বর্ণিত উনিশ শতকের ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা বিশ শতকে এসে কিছুটাও হলেও পরিবর্তনের দিকে এগিয়ে চলেছে।

উনিশ শতকে মার্কস-এঙ্গেলস পুঁজিবাদের চরিত্র ও তার গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। বিশ শতকে এসে পুঁজিবাদ তার চরিত্র পালটিয়ে একটা উচ্চস্তরে পৌঁছায়। লেনিন এই স্তরের নাম দেন সাম্রাজ্যবাদ। সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব ও তার ব্যাখ্যা মার্কসবাদী তত্ত্বে লেনিনের মৌলিক অবদান। তিনি তাঁর “সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর” নামক বইতে বিশেষ দশকে পুঁজিবাদের নতুন রূপ – ‘সাম্রাজ্যবাদের’ বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন। এই বইতে তিনি বারবার ভারত প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে উনিশ ও বিশ শতকের সন্ধিক্ষেত্রে এসে বিশ্বপুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদী স্তরে প্রবেশ করে। লেনিন উল্লেখ করেন, “উৎপাদকেরা সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর অভ্যন্তরীণ বাজার নিয়ে নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা না করার ব্যাপারে একমত হয় এবং বিদেশী বাজারকে তারা ভাগ করে এভাবে : গ্রেট ব্রিটেন ৬৬ শতাংশ, জার্মানি ২৭ শতাংশ, বেলজিয়াম ৭ শতাংশ। ভারতকে পুরোপুরিই গ্রেট ব্রিটেনের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়েছে”^৬।

ভারত সম্বন্ধে বিশেষ বিশ্লেষণের দ্বারা লেনিন লক্ষ্য করেন যে, এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য অংশের তুলনায় উনিশ শতকেই ভারত

বিশ্ববাণিজ্যের আওতার মধ্যে চলে আসে। ইংল্যান্ডের পুঁজিবাদী আকাঙ্ক্ষাই তার কারণ। লেনিন ভারতের ইতিহাস পর্যালোচনা করে উল্লেখ করেন যে, উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে ভারতে ব্রিটিশ পণ্য আমদানি আরও বাড়িয়ে দেওয়া হয়। আর কাঁচামাল রপ্তানি দ্রুত বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ পুঁজিও বাড়তে থাকে। রেলপথ, বন্দর ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে পুঁজি বিনিয়োগও বাড়াতে থাকে। উনিশ শতকের মাঝামাঝি মার্কস ভারতে পুঁজিবাদী বিকাশের পূর্বশর্তগুলো লক্ষ্য করেছিলেন। লেনিন বারবার একথার ওপর জোর দেন যে, ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বা ভারতের ক্ষেত্রে ইংল্যান্ড নিজের অর্থনৈতিক শক্তির যতই প্রসার ঘটাক না কেন, তার অধীনে থাকা দেশগুলোর সামাজিক-অর্থনৈতিক অগ্রগতি অবশ্যই ব্যাহত হবে। তিনি মনে করেন, স্বাধীনতা ছাড়া কোনো দেশের পূর্ণাঙ্গ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি ঘটানো সম্ভব নয়। ভারতসহ উপনিবেশগুলোর স্বাধীনতা প্রসঙ্গে লেনিন বলেন, ইউরোপের মতো এশিয়াকেও পণ্য উৎপাদনের সর্বাধিক পরিপূর্ণ বিজ্ঞান, পুঁজিবাদের সবচাইতে বেশি অবাধ, ব্যাপক ও দ্রুত বিকাশের পরিস্থিতি গড়ে ওঠা সম্ভব কেবল স্বাধীন জাতীয় রাষ্ট্র গঠন করার মাধ্যমে। তাঁর মতে ভারতের ওপর ইংরেজদের সীমাহীন লুণ্ঠনের এবং ভারতকে বিদেশী পণ্যের বাজারে পরিণত করার ফলে ভারতের নিজস্ব উৎপাদনশিল্প গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। ফলে ভারতে আশানুরূপ কলকারখানা গড়ে উঠতে পারেনি।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর ওপর অত্যাচার

কার্ল মার্কস ও ফ্রেডেরিক এঙ্গেলস ভারতে ঔপনিবেশিক সেনাবাহিনীর দুঃখ দুর্দশা ও তাঁদের ওপর ব্রিটিশদের মনোভাবের তীব্র নিন্দা করেন। শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে ১৮৫৭ সালে সশস্ত্র লড়াইয়ে জাতপাত ও ধর্ম নির্বিশেষে ভারতীয় সেনাদের নামতে বাধ্য করে। মার্কস-এঙ্গেলস সেনাদের এই বিদ্রোহকে সমর্থন করেন। তাঁরা এই বিদ্রোহকে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ বলে আখ্যায়িত করেন। মার্কস-এঙ্গেলসের মতো লেনিনও ভারতে ঔপনিবেশিক সেনাবাহিনীর ওপর ইংরেজ প্রভুদের অবর্ণনীয় অত্যাচার সম্বন্ধে বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। ১৯১২ সালে প্রকাশিত ড. জর্জ ওয়েগনারের ‘ইন্ডিয়া টুডে’ বইটি নিয়ে লেনিন নোট তৈরি করেন। সেখানে ভারতের সিপাহী বিদ্রোহ ছাড়াও এর জাতপাত, ধর্ম, হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক ইত্যাদি বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থান পায়। মার্কসের মতো লেনিনও তাঁর নোটে ‘বাঙালি’ শব্দটিও আলাদাভাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি ইংরেজরা কিভাবে ভারত ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশকে তাদের সামরিক ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করে তার উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ভারতীয় সেনাদের ইংরেজরা কামানের সস্তা খোরাক হিসাবে ব্যবহার করে। ১৯১৮ সালের ২৯ জুলাই অল রাশিয়া সেন্ট্রাল একজিকিউটিভ কমিটির এক সভায় লেনিন তাঁর ভাষণে বলেন, ইংরেজরা ভারতে ঘাঁটি গাড়ে নিজেদের ঔপনিবেশিক প্রভুত্ব বিস্তারের লক্ষ্যে জাতিসমূহের স্বাসরুদ্ধ করার জন্য। তেমনি তারা

সোভিয়েত রাশিয়ার ওপর বহুদিন থেকেই একটা নির্ভরস্থল গড়ে তুলেছিল^৪। তাঁর মতে বুর্জোয়ারা পিছিয়ে পড়া দেশগুলো থেকে সেনা সংগ্রহ করে নিয়ে আসে। ‘ব্রিটিশ বুর্জোয়ারা ভারত থেকে নিয়ে আসা সেনাদের বোঝানোর চেষ্টা করে যে, জার্মানদের বিরুদ্ধে ব্রিটেনকে রক্ষা করা ভারতের কৃষকদের কর্তব্য’^৯। তবে ১৮৫৭ সালের পর থেকে ইংরেজরা ভারত থেকে সেনা সংগ্রহের ব্যাপারে একটা বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করে^{১০}। লেনিন নিজের নোটে লিখে রাখলেন : ভারতীয় ফৌজকে গড়ে তোলা হয়েছে ‘নানা জাতির লোক নিয়ে’, ইংরেজরা কামান ও অস্ত্রাগার ... দেয় কেবল সাদা চামড়ার লোকদের হাতে। মোটের ওপর ইংরেজরা খুবই সতর্ক^{১১}।

১৯০৫ সালের রুশ বিপ্লব

১৯০৫ সালে লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়ার গণতান্ত্রিক বিপ্লব ভারতে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। এই সময় রাশিয়ার বিভিন্ন কলকারখানায় প্রায় ৪ লক্ষ ৪০ হাজার শ্রমিক ধর্মঘটে शामिल হয়। শাসকশ্রেণির বন্দুকের নলের কাছে সেখানকার শ্রমিকশ্রেণি সাময়িকভাবে আন্দোলন বন্ধ রাখতে বাধ্য হলেও ভারতসহ সারা দুনিয়ায় তার প্রভাব পড়ে। জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ১৯০৬ সালে প্রথম ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কাঠামোর মধ্যে ভারতের জন্য আত্মশাসনের দাবি তোলা হয়। এই সময়েই প্রথম ভারতের নানা শহরে জাতীয় মুক্তির স্লোগান তুলে শ্রমিকরা মিছিল করে। জাতীয়তাবাদী নেতা বাল গঙ্গাধর তিলকের শাস্তির প্রতিবাদে মুম্বাইয়ে (বোম্বাই) মিছিল হয়। মুম্বাইয়ের প্রায় ১ লক্ষ সূতাকল শ্রমিক এই ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করে। এর পরবর্তী সময়ে ভারতের নানা অঞ্চলে ব্যাপকহারে শ্রমিক ধর্মঘট ও গণ-অভিযান সংগঠিত হয়।

১৯০৮ সালে লেনিন তাঁর বিশ্ব রাজনীতিতে দাহবস্তু নামক বিখ্যাত প্রবন্ধে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট মতামত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, ভারতে ‘সুসভ্য’ ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের দেশীয় ক্রীতদাসেরা তাদের ‘প্রভুদের বাজে ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি ফেলেছে ঠিক এই সময়টাতেই। যাকে বলা হয় ভারতে ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা, তাতে চলে অবিরাম জুলুম ও লুণ্ঠতরাজ। এমন বারমেসে অনশন দুনিয়ার আর কোথাও দেখা যাবে না – বলাবাহুল্য রাশিয়া ছাড়া। ... কিন্তু ভারতে নিজেদের লেখক ও রাজনৈতিক নেতাদের পক্ষ নিয়ে জেগে উঠতে শুরু করেছে রাজপথ। ব্রিটিশ শেয়ালেরা ভারতীয় গণতন্ত্রী তিলককে যে নিচ দণ্ড দেয় – টাকার খলির চাপরাশিদের পক্ষ থেকে গণতন্ত্রীর ওপর এই প্রতিহিংসায় মুম্বাইয়ের পথে পথে দেখা দেয় মিছিল আর ধর্মঘট’^{১২}।

লেনিন মুম্বাইয়ের ধর্মঘটকে ব্যাপক সংখ্যক ভারতবাসীর জাগরণের সূচনা হিসাবে দেখেছিলেন। তাঁর মতে এই ধর্মঘট ছিল ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসানের সূচনা। ১৯০৮ সালে তিনি বলেন, ভারতেও সর্বহারাশ্রেণির রাজনৈতিক সচেতনতা গণসংগ্রামের স্তরে বাড়ছে। আর তাহলে ভারতে রাশিয়ার ধরনের ব্রিটিশ শাসনের অবসান অনিবার্য^{১৩}। ১৯১৩ সালের ৭মে প্রাভদার ১০৩নং সংখ্যায় লেনিন এশিয়ার

জাগরণ নামে এক প্রবন্ধে বলেন, “১৯০৫ সালের রুশ বিপ্লবের প্রভাব গোটা এশিয়া জুড়েই পড়বে। ব্রিটিশ ভারতেও সেই অবস্থা জন্ম নিচ্ছে”¹⁴। লেনিন এই সংগ্রামকে জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম বলে উল্লেখ করেন। ১৯১৭ সালের মে মাসে এক বক্তৃতায় তিনি বলেন, ভারতে মূলত সেইসব দাবি তোলা হয়েছে, যার জন্য আমাদের এখানে আমরা সংগ্রাম করছিলাম”¹⁵। ১৯১৯ সালে ভারতের জালিয়ানওয়ালা বাগ হত্যাকাণ্ডের পর লেনিনের তরফ থেকে ভারতে অমৃতবাজার পত্রিকায় এক তারবার্তায় জানানো হয়: “আপনার বহুল প্রচারিত সংবাদপত্রে প্রকাশিত জালিয়ানওয়ালা বাগের রক্তাক্ত সংঘর্ষের একটি বিবরণ মিঃ লেনিন পড়েছেন। তাঁর পক্ষ থেকে জনগণের উদ্দেশ্যে তিনি আমাকে জানাতে বলেছেন যে, তাঁর ভারতীয় ভাইদের ন্যায্য আদর্শের প্রতি সোভিয়েত সরকারের পূর্ণ সহানুভূতি রয়েছে।”¹⁶।

লেনিনের মতে, “বিশ্বপুঁজিবাদ ও ১৯০৫ সালের রুশ বিপ্লব চূড়ান্তভাবে এশিয়াকে জানিয়েছে।”¹⁷ এই বিপ্লবের পরেই ১৯০৬ সালে একটি বাংলা প্রচারপত্রে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নামার আহ্বান জানিয়ে এবং ‘বাবু ও জমিদারেরা’ নয়, কৃষকরাই ভারতকে মুক্ত করতে সক্ষম। এই ঘোষণায় বলা হয় ‘আমরা নিজেরাই দেশ শাসন করব। নিজেরাই টোকিদার বহাল করবো। জমিদারেরা যদি আমাদের পীড়ণ করে, তাহলে প্রাণ দেব তবু ধ্বংস করবো তাদের।’¹⁸। ১৯০৫ সালের রুশ বিপ্লবের পর থেকেই ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতৃত্বদ্বন্দ্ব ক্রমশ রাশিয়ার আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহী হয়ে ওঠেন। ১৯০৬ সালের ডিসেম্বরে কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন থেকে দাদাভাই নওরজি’র সভাপতিত্বে কংগ্রেসের অধিবেশন থেকেই তেরঙ্গা পতাকা ওড়ানো হয়। এই অধিবেশন থেকেই ‘স্বরাজ’ বা স্বাযত্ত্ব শাসনকে আন্দোলনের উদ্দেশ্যে হিসাবে ঘোষণা করা হয় এবং বয়কট, স্বদেশী ও জাতীয় শিক্ষার সমর্থনে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। গোপালকৃষ্ণ গোখলে সহ কংগ্রেসের মধ্যপন্থীরাও এই প্রস্তাবকে সমর্থন জানায়। স্বদেশী আন্দোলন খুব তাড়াতাড়ি সমগ্র জাতির আন্দোলনে পরিণত হয়। গান্ধিজী অবশ্য তখনও ভারতীয় রাজনীতিতে অপরিচিত। তিনি ১৯০৩ থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকাতে ছিলেন।

এই সময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরসহ বহু কবি সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক জগতের শিল্পীরা সরকারি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে যোগ দেন। সোভিয়েত সাহিত্যিক তলস্তয় ও গোর্কির সঙ্গেও তাঁদের বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের নেতাদের সঙ্গে ইউরোপ ও আমেরিকার সমাজতন্ত্রীদের সঙ্গে পারস্পরিক যোগাযোগ তৈরি হয়। এরমধ্যে ছিলেন শ্যামজি কৃষ্ণবর্মা, ভিখাজি রুস্তম কামা প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। বিপিনচন্দ্র পাল ও লালা লাজপত রায় প্রমুখ জনপ্রিয় নেতাদের সঙ্গে ইংরেজ সোশ্যাল ডেমোক্রেট ও উদারপন্থীদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সাপূরজি শওকতয়ালা ও বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি নেতৃত্বদ্ব ভারতীয় প্রবাসী বিপ্লবী দল গড়ে তোলেন। ১৯০৭ সালে রুস্তম কামা ও সি আর রানা জার্মানির স্টুটগার্ট শহরে আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক কংগ্রেসে যোগ দেন। মাদাম কামা ভারতে

ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বক্তব্য রেখে ‘বন্দেমাतरম’ ধ্বনি সহকারে একটি তেরঙ্গা পতাকা তুলে ধরেন। এই সম্মেলনে লেনিনের নেতৃত্বে আর এস ডি এল পি’র প্রতিনিধিরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯০৫-০৬ সালে সূতাকলে ধর্মঘট ছাড়াও বড়ো দুটো ধর্মঘটে হাজার হাজার শ্রমিক शामिल হন।

ইংরেজদের কুৎসিত বিভাজন নীতি

ভারতীয়দের ওপর তাদের শাসন ও অত্যাচার যে আর বেশিদিন চালানো সম্ভব হবে না, সেকথা ইংরেজরা বুঝতে পারে ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহ বা ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের পর থেকেই। ধর্ম ও জাতপাতের বাধা ভেঙে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যবদ্ধ ভাবে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নেয়। মার্কস বলেন, ‘হিন্দুদের মধ্যে থেকে এই বিদ্রোহ শুরু হয়ে তা শেষ হয়েছে দিল্লির সিংহাসনে এক মুসলমান সম্রাটকে বসিয়ে।’ অত্যন্ত নিষ্ঠুর ভাবে ইংরেজরা এই বিদ্রোহ দমন করলেও হিন্দু-মুসলমান ঐক্য তাতেও বিঘ্নিত হয়নি। ১৯০৬ সালেও ধর্ম ও জাতপাত ভুলে গিয়ে সর্বহারাপ্রাণি ঐক্যবদ্ধ ভাবে নানা ধর্মঘটে शामिल হয়। বিশেষ করে বাংলা ও পাঞ্জাবে কৃষকদের মধ্যে সার্বিক ঐক্যে মাধ্যমে বিলিতি পণ্য বর্জনের আন্দোলন শুরু হয়। তখন যেসব প্রচারপত্র বিলি করা হতো নমুনা হিসাবে তার একটিতে বলা হয়, ‘আমাদের কুটিরশিল্পি ধ্বংসকারী, আমাদের তাঁতি ও কামারদের পেশা হরণকারী এই চোরদের কি করে নিজেদের শাসক হিসাবে স্বীকার করবো? তারা তাঁদের দেশে তৈরি অজস্র পণ্য আমদানি করে, আমাদের বাজারে, আমাদের জনগণের কাছে এগুলি বিক্রি করে, এভাবে আমাদের ধনদৌলত লুট করে, আমাদের অনাহার, জ্বর ও প্লেগের মধ্যে ঠেলে দেয় তাদের আমরা কিভাবে শাসন ভাববো? যারা আমাদের উপর ক্রমাগত করে বোঝা চাপাচ্ছে সেইসব বিদেশীদের আমরা কিভাবে শাসকের স্বীকৃতি দেব? ... ভাইসব, আপনারা এগুলি যত সহ্য করবেন এই শঠতা ততো বেশি আপনারদের শোষণ করবে। আপনারদের শক্ত পায়ে দাঁড়াতে হবে, মুক্তির পথ খুঁজতে হবে। ভাইসব, আমরা দুনিয়ার সেরা জাতি। আমাদের ধনদৌলতেই তারা আজ কর্ম না করে নিজেদের মেদ বাড়চ্ছে। এরা আমাদের রক্তপায়ী। আমরা কেন এইসব সহ্য করবো? ... হিন্দু ভাইয়েরা কালী, দুর্গা, মহাদেব ও শ্রীকৃষ্ণের নামে শপথ করুন, মুসলমান ভাইরা আল্লার নামে কসম নিন আর গ্রামে গ্রামে আওয়াজ তুলুন – হিন্দু-মুসলমান কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দেশের সেবা করবে। ... ভাইরা জাগুন! জন্মভূমির সুযোগ্য সন্তানের পরিচয় দিন, সাহসের সঙ্গে লড়াই করুন, বাংলা মায়ের জন্য প্রাণ কুরবানি দিতে প্রস্তুত হন।’¹⁹

বিতড়িত হওয়ার ভয়ে ব্রিটিশরা ‘ভাগ করে শাসন কর’ – এই নীতি চালু করে। দুইভাবে এই নীতি চালু হয়। প্রথমত ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের শক্ত ঘাঁটি বাংলাকে দুই ভাগে ভাগ করা, দ্বিতীয়ত, ধর্মের ভিত্তিতে হিন্দু-মুসলমানদের ভাগ করার জন্য সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিয়ে অস্থিরতা তৈরি করা।

১৯০৫ সালে ভাইসরয় কার্জন বাংলাকে ভাগ করার সিদ্ধান্ত নেন।

বঙ্গভঙ্গ আইন জারি করা হয়। সারা বাংলা এর বিরুদ্ধে গর্জে ওঠে। বিলিতি জিনিস বয়কটের ডাক দেওয়া হয়। চতুর ইংরেজ শাসক নিজেদের উদ্দেশ্যে পুরণের জন্য ১৯০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে ঢাকার ‘মুসলিম লিগ’ নামে ব্রিটিশের সহযোগী একটি প্রতিক্রিয়াশীল সংগঠন তৈরি করে। ১৯১০ সালে ভাইসরয় লর্ড মিন্টো পৌরসভা ও আইন পরিষদে মুসলমানদের জন্য আলাদা আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে। ভারতে সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের নীতি গ্রহণের মাধ্যমেই সাম্প্রদায়িকতার বীজ বোনা হয়। এটাকেই অনেকে ভারত ভাগের বিষাক্ত পদক্ষেপ বলে মনে করেন।

ভারতে নভেম্বর বিপ্লবের প্রভাব

লেনিনের নেতৃত্বে নভেম্বর বিপ্লব এশিয়ার যেসব দেশকে প্রভাবিত করেছে ভারত তার মধ্যে অন্যতম। জাতীয় কংগ্রেসের সভানেত্রী অ্যানি বেসান্ত কংগ্রেসের অধিবেশনে বলেন, ‘রুশ বিপ্লব এবং ইউরোপ ও এশিয়ায় রুশ প্রজাতন্ত্রের সম্ভাব্য প্রতিষ্ঠা’ হলো এমন একটি ঘটনা যা ভারতের আগেকার অবস্থা আমূল বদলে দিয়েছে²⁰। হোমরুল কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত ‘রাশিয়ার উদ্বোধন’ নামে পুস্তিকায় ভারতের শিক্ষিত সমাজের প্রতি এক আবেদনে রুশ বিপ্লবের তাৎপর্য ও মূলকথাগুলো ভালোভাবে উপলব্ধি করার কথা বলা হয়²¹। এলাহাবাদ থেকে প্রকাশিত ‘অভ্যুদয়’ নামে এক পত্রিকায় লেখা হয়, ‘উদ্ভিপক, প্রাণদাত্রী জাতীয়তাবাদের কাছে যে পৃথিবীর সকল বাধাই তুচ্ছ, রাশিয়ার বিপ্লব থেকে আমরা তা বুঝতে পেরেছি।’ লালা রাজপত রায়ের মতে, “বলশেভিক সরকার সমস্ত নিপীড়িত জাতিদের মুক্তি দিয়েছে²²। রবীন্দ্রনাথ রুশ বিপ্লবকে বলেন, “নব্যযুগের উষা সমাগমের প্রভাতী তারা।” রাশিয়া ভ্রমণ তাঁর কাছে ছিল “তীর্থদর্শন।” বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর ‘ওয়াল্ড সিচুয়েশন অ্যান্ড আওয়ারসেলভস’ বইতে বলেন “বলশেভিকবাদের অর্থ ধনীদের এবং তথাকথিত উচ্চশ্রেণির পক্ষ থেকে শোষণ ও পীড়ণ ছাড়া মুক্তিতে ও সুখে বাস করার জন্য জনগণের অধিকার²³। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু লিখলেন, “মার্কস ও লেনিনের রচনা পাঠ আমার চেতনার ওপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করে এবং ইতিহাস ও বর্তমান জীবনকে নতুন আলোয় দেখতে সাহায্য করে²⁴।

নভেম্বর বিপ্লবের পরবর্তী সময়ে ভারতের বিপ্লবী গুপ্ত সমিতিগুলোর কর্মীদের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ দেখা যায়। অনেক বিপ্লবী দল রাশিয়ার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করে। মুসলিম জাতীয়তাবাদীদের এক সভায় রুশ বিপ্লবকে অভিনন্দন জানিয়ে গৃহীত প্রস্তাব লেনিনের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য সান্তার খৈরি ও জব্বার খৈরি নামে দুই ভাইকে পাঠানো হলে ১৯১৮ সালের ২৩ নভেম্বর লেনিন তাঁদের অভ্যর্থনা জানান। ২৫ নভেম্বর তাঁরা সারা রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সভায় যোগ দেন এবং জব্বার খৈরি সে সভায় বক্তব্য পেশ করেন। তিনি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে রাশিয়ার সহায়তা পাবার আশা প্রকাশ করেন। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে কাবুলে ভারতের স্বাধীন অস্থায়ী সরকার ঘোষিত হয়। মহেন্দ্র প্রতাপ

ছিলেন এই সরকারের রাষ্ট্রপতি। আর প্রধানমন্ত্রী ছিলেন বরকতউল্লাহ। সোভিয়েত সরকারের তরফ থেকে তাঁদের মাধ্যমে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকারীদের প্রতি সংহতি জানানো হয়। ভারতে মর্ডান রিভিউ সহ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সমর্থক বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় নভেম্বর বিপ্লবকে সমর্থন জানিয়ে প্রচুর লেখা প্রকাশিত হয়। বাংলায় বিশেষ করে নজরুল ইসলাম, মুজফফর আহম্মদ পরিচালিত ‘লাঙল’, ‘গণবাণী’ প্রভৃতি পত্রিকায় রুশ বিপ্লব ও লেনিন সম্বন্ধে বহু লেখা প্রকাশিত হয়। ১৯২১ সালে এস এ ডাঙ্গে’র গান্ধি বনাম লেনিন’ বইটির নামও উল্লেখ করা যেতে পারে।

কাবুল অনুষ্ঠিত ইন্ডিয়া রেভোলুশনারি অ্যাসোসিয়েশন থেকে লেনিনকে এক অভিনন্দনবার্তা পাঠানো হয়। তার জবাবে ১৯২০ সালের ২০মে-তে এক বার্তায় তিনি জানান, রাশিয়ার শ্রমজীবী মানুষ ভারতের শ্রমিক ও কৃষকদের ক্রমাগত বেড়ে চলা শক্তির দিকে অবিরাম নজর রেখে চলেছে। শ্রমজীবী মানুষের সংগঠন, তার শৃঙ্খলাবোধ এবং তাদের অধ্যবসায় ও দুনিয়ার শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে একাত্মবোধই তাদের সাফল্যের মূল চাবিকাঠি। আমরা মুসলমান ও অমুসলমানদের ঘনিষ্ঠ মৈত্রীকে স্বাগত জানাই। আমরা মনেপ্রাণে চাই যে, এই মৈত্রী প্রাচ্যের সমস্ত মেহনতি মানুষের মধ্যে সম্প্রসারিত হোক²⁵। ১৯২৩ সালের ২ মার্চ লেনিন তাঁর জীবনের শেষ লেখা ‘বর’ অল্প হোক, কিন্তু ভালো হোক’ এ বলেন : “শেষ পর্যন্ত রাশিয়ায় ভারত ও চীন ইত্যাদি দেশগুলো দুনিয়ার বৃহত্তম জনসংখ্যার অধিকারী হওয়ার ঘটনাই সংগ্রামের ফলাফল ঠিক করে দেবে। গত কয়েক বছরে এই সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই খুবই তাড়াতাড়ি মুক্তিসংগ্রামের শরিক হওয়া শুরু করেছে।”²⁶।

কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা

১৯১৭ সালে রাশিয়ার নভেম্বর বিপ্লবের মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যেই দুনিয়ার ৪০টিরও বেশি দেশে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে ওঠে। সোভিয়েত বিপ্লবের ফল হিসাবে পৃথিবীর ১৪টি দেশ পুঁজিবাদী শোষণের জোয়াল ছিঁড়ে ফেলে সমাজতান্ত্রিক শাসন কায়েম করে। এখনও পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই কোনো না কোনো নামে কমিউনিস্ট পার্টি শোষিত মানুষের মুক্তির জন্য লড়াই করে চলেছে।

নভেম্বর বিপ্লবের তিন বছর পরে ১৯২০ সালের ১৭ অক্টোবর আনুষ্ঠানিক ভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের তাসখন্দে সাতজন সদস্যকে নিয়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়। মুহম্মদ শফিক সিদ্দিকি ছিলেন প্রথম সম্পাদক কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার অভিযোগে ব্রিটিশ সরকার পেশোয়ারে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে তাসখন্দ ও মস্কো যড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে। অন্যান্য আরও সাজানো মামলার মাধ্যমে ভারতে কমিউনিস্টদেরকে জেলে পুরে নানা অত্যাচার করা হয়। ১৯২১ সালে কমিউনিস্টদের উদ্যোগে প্রাচ্যের মেহনতি মানুষের জন্য কমিউনিস্ট বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রবাসেই ভারতীয়দের নিয়ে একটা দল গঠিত হয়। মানবেন্দ্রনাথ রায়ের উদ্যোগে দ্বিতীয় কমিউনিস্ট কংগ্রেসের সময় মস্কোতে আর একটি ভারতীয় বিপ্লবী

কমিটি গঠিত হয়। তাসখন্দ ও মস্কো থেকে শিক্ষালাভের পর মুহম্মদ শফিক, শওকত ওসমানী সহ একটি দল ভারতে ফিরে ফিরে এসে বিপ্লবী কর্মসূচিতে যুক্ত হয়। ভারতের মানবেন্দ্রনাথ রায় লেনিন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত তৃতীয় আন্তর্জাতিকের সদস্য নির্বাচিত হন। ঔপনিবেশিকতার প্রক্ষে লেনিনের থিসিসের পালাটা একটা থিসিস তিনি কংগ্রেসে পেশ করেন। বেশিরভাগ সদস্য লেনিনের থিসিসটিই গ্রহণ করেন। গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই লেনিন বিষয়টি বিবেচনা করতে বলেন।

মুজফফর আহম্মদ তাঁর ‘আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টিতে বলেন “আমরা ১৯২২ সালে এদেশে কাজ আরম্ভ করি”^{২৭} তবে ১৯২১ সালেই কংগ্রেসের আহম্মেদাবাদ অধিবেশনে হজরত মোহানি তাঁর উত্থাপিত এক প্রস্তাবে ‘স্বরাজ’কে সমস্ত বৈদেশিক নিয়ন্ত্রণমুক্ত এক পূর্ণ স্বাধীনতা বলে ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু তখন গান্ধীজি এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন।^{২৮} জওহরলাল নেহরু দেড় বছর ইউরোপ সফর করার পর দেশে ফিরে এসে জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে বামঘেঁষা নীতি প্রচার করেন।^{২৯} এই সময়ে সারা ভারতে ইংরেজ বিরোধী বিপ্লবী আন্দোলন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। বিপ্লবী ভগৎ সিং ফাঁসির দড়ি গলায় পড়ার আগে শেষ যে বইটি পড়েছিলেন তা ছিল লেনিনের জীবনী।

স্বাধীন ভারতের সংবিধানেও কিছুটা পরিমাণে লেনিনবাদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ভারতের সংবিধানের চতুর্থ খণ্ডে রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতির মধ্যে মঙ্গলকর রাষ্ট্রের ধারণা প্রতিফলিত হয়েছে। ভারতে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ধারণাটিও সোভিয়েত ইউনিয়নের অনুসরণে নেওয়া হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনায় ‘সমাজতান্ত্রিক’ ও ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ এই দুটি শব্দ যোগ করার ফলে ভারতের সংবিধানের মূলনীতি স্পষ্ট হয়ে যায়।

বর্তমান সময়ে ভারতে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, সমাজতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণার ওপর আর এস এস নিয়ন্ত্রিত সাম্প্রদায়িক বি জে পি সরকার নির্লজ্জ আঘাত নামিয়ে এনেছে। এই দল ভারতের ঐতিহ্যকে ধ্বংস করতে চাইছে। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ সরকারের মতো ওরা হিন্দু-মুসলমান হিসাবে দেশের মানুষকে ভাগ করে গোটা দেশটাকেই ভাগ করতে চাইছে।

লেনিন ভারতের সাম্প্রদায়িক শক্তি সম্বন্ধে আগেই সতর্ক করে দিয়েছিলেন। এই শক্তি লেনিনকে শত্রু মনে করে। তাই সাম্প্রদায়িক শক্তি ভারতের নানা জায়গায় লেনিনের মূর্তির ওপর হামলা করছে। তবে লেনিন মূর্তি ভেঙে লেনিনবাদকে ধ্বংস করা যায় না। অনাদাশঙ্কর রায়ের কথায় বলা যায় :

লেনিন মূর্তি না বাঁচে তো
গান্ধিও কি বাঁচবে?
গান্ধি মূর্তি ধ্বংস করে

নাচবে ওরা নাচবে। ...

... বিশ শতকের সঙ্গে লড়ে
অষ্টাদশ কি পারবে?
ভাঙবে কিছু, চুরবে কিছু
সর্বশেষে হারবে।



সূত্র-নির্দেশিকা

- ১ মার্কস-এঙ্গেলস, সিলেক্টেড ওয়ার্কস, প্রোগ্রেস পাবলিশার্স, মস্কো, ১৯৬৯, খণ্ড ১, পৃঃ ৪৯২-৯৩।
- ২ লেনিন, কালেক্টেড ওয়ার্কস, প্রোগ্রেস পাবলিশার্স, মস্কো, ১৯৭৭, খণ্ড ৩, পৃঃ ৩২৯।
- ৩ প্রদোষকুমার বাগচি, লেনিনের গ্রন্থাগার ভাবনা ও অধ্যয়ন, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০১ পৃঃ ১৩২।
- ৪ লেনিন, চিনে যুদ্ধ, সংগৃহীত রচনাবলী, খণ্ড ৪, পৃঃ ৩৭৩ (বর্তমান লেখায় লেনিনের সংগৃহীত রচনাবলী, প্রোগ্রেস পাবলিশার্স, মস্কোর ইংরেজি সংস্করণ থেকে উদ্ধৃত দেওয়া হয়েছে)।
- ৫ ওই খণ্ড, ৫ পৃঃ ৯০।
- ৬ ওই, খণ্ড ২২ পৃঃ ২৫১।
- ৭ ওই, খণ্ড ৩৯, পৃঃ ৪৯৭-৯৮।
- ৮ ওই, খণ্ড ২৮, পৃঃ ২৩।
- ৯ ওই খণ্ড, ৩১ পৃঃ ২৩২।
- ১০ এ কমারোভ, লেনিন ও ভারতবর্ষ, প্রগতি প্রকাশন, ১৯৭৫, পৃঃ ৩২।
- ১১ ওই, খণ্ড ৩৯, পৃঃ ৪৬৭।
- ১২ লেনিন, এশিয়ায় জাগরণ, প্রগতি প্রকাশন, ১৯৭৯, পৃঃ ১১।
- ১৩ ওই খণ্ড, ১৯ পৃঃ ১৮৪।
- ১৪ ওই খণ্ড, ১৯, পৃঃ ৮৫।
- ১৫ ওই খণ্ড, ২৪, পৃঃ ৪০৭।
- ১৬ শুভাশীষ গুপ্ত, সংযোগ, পশ্চিমবঙ্গ সাব অর্ডিনেট ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন, ১৯৯১, পৃঃ ৩২১।
- ১৭ ওই, খণ্ড, ১৫, পৃঃ ৮৫।
- ১৮ দ্য টাইমস, জুন ৪ ১৯০৬।
- ১৯ আন্তোনিভা, বোনাগার্দ-লেভিন, কতোভস্কি, ভারতবর্ষের ইতিহাস, প্রগতি প্রকাশন, ১৯৮২, পৃঃ ৫০০।
- ২০ কমারোভ, লেনিন ও ভারতবর্ষ, পৃঃ ৭৪।
- ২১ হোমরুল সিরিজ, ২৩।
- ২২ বন্দেমাতরম, জুলাই ১৯২০।
- ২৩ ওই, পৃঃ ৪১।
- ২৪ জওহরলাল নেহরু, দ্য ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া, অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটি প্রেস, নিউ দিল্লি, ১৯৯০ পৃঃ ২৯
- ২৫ লেনিন, ওই খণ্ড, ৩১, পৃঃ ১৩৮।
- ২৬ ওই, খণ্ড, ৩৩, পৃঃ ৫০৮।
- ২৭ মুজফফর আহম্মদ ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি ও আমরা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ১৯৮১, পৃঃ ২০৩।
- ২৮ বি টি রণদিভে, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে কমিউনিষ্টদের ভূমিকা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ১৯৮৫, পৃঃ ৮।
- ২৯ সরোজ মুখোপাধ্যায়, তিনটি দশক, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ১৯৮০, পৃঃ ২৩।



শ্রীতিময় লেনিন

মানবেশ চৌধুরি

এখন বৈশাখ মাস / তপ্ত বাঙ্গার মাস। মাঝে
মাঝে খরার দুপুর / লেনিনের মাস এটা / কত
স্বপ্ন দেখেছেন তিনি / স্বপ্নময় তাঁর সে জগৎ
/ শ্রীতিময় তাঁর যে সংসার / কত তাঁর মনের বৈভব /
বহুপর্নী তার কত রঙ।

কত কষ্ট মানুষের বুক / কত কষ্ট উৎসারিত / কত
কষ্ট অবরুদ্ধ / যন্ত্রণায় বিদ্ধ সে মানুষ / লেনিনের আপনার
জন। / মানুষ মানুষ করে পাগল হলেন / মানুষ মানুষ
করে ঘর ছাড়লেন / মানুষ মানুষ করে কোন সুদূরের /
সম্ভাবনার এক মৃদু আভা দেখে / কত কত বেদনার পথ

হাঁটলেন। / খেতের তরমুজ নিয়ে চাষিরা এসেছে / প্রগাঢ় বিমুগ্ধ
গেঁয়ো চাষি / প্রত্যাভরে বাকরুদ্ধ আবেগ কম্পিত / ভ্লাদিমির ইলিচ
লেনিন।

অনেক দিন আগে আমার লেখা একটি দীর্ঘ পদ্যের কয়েকটি
লাইন। তা দিয়েই কথারস্ত করলাম।

লেনিন বলশেভিক (কমিউনিস্ট) পার্টি, সোভিয়েত বিপ্লবের
সর্বাধিনায়ক ছিলেন। ছিলেন নবীন সোভিয়েত রাষ্ট্র নির্মাণের
মূল স্থপতি। মার্কসবাদকে উপজীব্য করে, সমাজ ও জীবনকে
অনুপস্থিতভাবে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে তিনি যুগোপযোগী তাত্ত্বিক
ভীত নির্মাণ করেছিলেন – লেনিনবাদ। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ। এই
কারণে, তিনি শুধু সোভিয়েত রাশিয়ার নয়, সারা পৃথিবীর সমাজ
বিপ্লবের নেতা। সেজন্যই তো সুকান্ত ভট্টাচার্য লিখেছিলেন – “বিপ্লব
স্পন্দিত বৃক্কে মনে হয় আমিই লেনিন”। বলেছিলেন – “এখানেও
আয়োজন পূর্ণ করে নিঃশব্দে লেনিন।”

আমি এই লেনিনকে নিয়ে বিশ্লেষণ করে নিবন্ধ লিখতে পারঙ্গম
নই।

আমার কাছে সোভিয়েতের মজুর চাষিদের কাছে তিনি কত প্রিয়
ছিলেন, পক্ষান্তরেও তিনিও তাদের কাছে, সেই সংক্রান্ত কিছু নথি
আছে। সেসব থেকে নিয়ে একটা রচনা লেখার চেষ্টা করছি।

২

জন রিডের ‘দুনিয়া কাঁপানো দশদিন’ আমাদের পাঠকদের
সবারই পড়া। আমি তার বঙ্গানুবাদ থেকে উদ্ধৃতি দেব। তখন যাঁরা
মস্কোতে বা তাসখন্দে বঙ্গানুবাদের কাজ করতেন, বিদেশী ভাষায়
সাহিত্য প্রকাশনালয়ে বা রাদুগা প্রকাশনীতে তারা এক একজন
বাংলা ভাষার দিকপাল গদ্যকার, সাহিত্যিক। অনুবাদও যে এত
সাহিত্যগুণ মণ্ডিত হতে পারে, তা ভাবলে ঐ সব অনুবাদকের প্রতি
মস্তক স্বতই নম্য হয়।

জন রীড পেত্রগ্রাদে ছিলেন বিপ্লবের ঝড়ো দুনিয়া কাঁপানো দশ
দিনের মধ্যে কয়েক দিন। তাঁর কথায় – “দুই শতাব্দী ধরে সরকারের
পাদপীঠ হওয়া সত্ত্বেও পেত্রগ্রাদ তখনও একটা কৃত্রিম নগর। আর
মস্কো হল আসল রাশিয়া, রাশিয়ার অতীত ভবিষ্যৎ এখানেই।
মস্কোতেই আমরা হৃদিশ পাব বিপ্লব সম্পর্কে রুশ জনগণের আসল
মনোভাবের। জীবন এখানে আরও প্রখর।”

অতএব, যাত্রাপথের নানা কষ্ট স্বীকার করে তিনি মস্কোতে
এলেন। এক পর্যায়ে এলেন ক্রেমলিনের একটা কক্ষে। সেখানে
তখন কী হচ্ছে? – “জনা পঞ্চাশেক মেয়ে বসে কাটাকুটি করে
সেলাই করে তুলছে বিপ্লবী শহীদদের অস্ত্রোষ্টি-অনুষ্ঠানের ফেস্টুন
আর পতাকা। জীবনের দুঃসহন পর্বের মধ্য দিয়ে আসায় মুখগুলো
তাদের সবাই যেন রুক্ষ, ক্ষতবিক্ষত; কঠোর মনোযোগে এখন কাজ
করে চলেছে তারা, অনেকের চোখই কান্নায় লাল। লাল ফৌজের
ক্ষতি হয়েছে অনেক।”

জন রীডের দেখা হল মস্কো ধাতু শ্রমিক ইউনিয়নের সম্পাদক,

এখন লড়াইয়ের সময় হয়েছেন সামরিক বিপ্লবী কমিটির এক
কমিশনার; তাঁর সঙ্গে – “জ্বলজ্বলে কয়েকটি কাহিনী শোনা গেল
তাঁর কাছ থেকে। তুহিন ধূসর একটা দিন, দাঁড়িয়ে আছেন তিনি
নিকিৎস্কার কাছে, মেসিনগান গুলির বড় বইছে। একদল বাচ্চা
ছুটেছে সেখানে – রাস্তার সেই সব হাঘরে ছেলে কাগজ বেচত যারা।
তাদের কাছে যেন এক নতুন খেলা, উত্তেজনায় তারস্বরে চিৎকার
করে অপেক্ষা করছে তারা কখন গুলিবর্ষণে একটু টিলে পড়বে, টিল
পড়তেই ছুটে রাস্তা পেরবার চেষ্টা করছে সবাই – অনেকেই মারা
পড়ে, কিন্তু বাকিরা বেপরোয়ার মতো পরস্পর পালা দিয়ে এপার
ওপার ছোটাছুটি করে গেছে”

তারপরে ক্রেমলিনের সামনেরকার লাল ময়দানের শহীদদের
অস্ত্রোষ্টির কথা, যা পড়তে পড়তে হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হতে থাকে।

“ধুলোবালি ইট পাথরের পাহাড়। ... বিরাট দুটি গর্ত – দশ কি
পনের ফিট গভীর, পঞ্চাশ গজ লম্বা, শত শত সৈনিক ও শ্রমিক
এখানে বড়ো বড়ো অগ্নিকুণ্ডের আলোয় মাটি খুঁড়ছে।”....

....একজন ছাত্র বলছে আমাদের যারা জার, সেই জনতা নিদ্রা
যাবে এখানেই....”

“.... লাল সমাধিতে পৌরোহিত্যের নেই কোন পাদ্রী
দোকানপাটও বন্ধ, ধনীরা ঘর থেকে বেরোয় নি; অবিশ্যি অন্য
কারণে। এ যে জনগণের দিবস। তাদের আগমন ধ্বনি গর্জে উঠেছে
সমুদ্র ঝাপটের মতো

“সবকটি রাস্তা জুড়ে জনশ্রোত এসে পৌঁছেছে লাল ময়দানে,
আসছে হাজার হাজারে দেখতে তারা গরিব মেহনতি।”

“....সেই রুক্ষ অমার্জিত লোকগুলোর মুখ বেয়ে নামছে চোখের
জল, তার পেছু পেছু ফোঁপাতে ফোঁপাতে, চিৎকার করে কাঁদতে
কাঁদতে আসছে মেয়েরা, নিশ্চাণ বিবির্ঘ মুখে পা ফেলে যাচ্ছে যন্ত্রের
মতো।

“ব্যান্ডে বাজছিল বৈপ্লবিক অস্ত্রোষ্টি মার্চ আর মাথার টুপি খোলা
বিশাল জন সমুদ্রের সঘন সঙ্গীতের পাট ভেঙে ভেঙে পড়ছিল
অশ্রুরুদ্ধ সুর”

‘ভাতু সমাধি’র বর্ণনা। হিসাবে মনে হয় এই তারিখটি ১৭ই
নভেম্বর।

“ধীরে ধীরে কফিন এসে পৌঁছলো সমাধির কাছে, বোঝা নিয়ে
টিবির ওপর উঠে নেমে এল গর্তে। তাদের অনেকেই নারী – শক্ত,
সমর্থ, গাঁট্রাগোটা প্রলেতারিয় নারী। “পাঁচ শত শ্রমিক ও সৈনিক
শহীদকে সেই গর্তে শায়িত করা হল।

“সারা দিন ধরে চলল অস্তিম মিছিল, এল তারা ইবেরিয়ান
ফটক দিয়ে, চলে গেল নিকোলাস্কায়া পেরিয়ে, লাল পতাকার এক
নদী শ্রোত, বহন করে চলল আশা আর ভ্রাতৃত্ব আর বিপুল এক
ভবিষ্যতের বানী, পঞ্চাশ হাজার জনতার এক পটভূমির সামনে
দিয়ে, বিশ্বের সমস্ত শ্রমিকজন ও তাদের অনন্ত বংশধরদের দৃষ্টির
তলে

“.... হঠাৎ অনুভব করলাম, স্বর্গে পৌঁছবার জন্য ধর্মপ্রাণ

রুশীদের আর পুরোহিতদের প্রয়োজন নেই। মর্ত্যে তারা যে রাজ্য গড়তে শুরু করেছে তা কোনো স্বর্গেও পাবার নয়; তার জন্য মৃত্যু বরণ – গৌরবের কথা।”

জন রীড এই সব বর্ণনার এক জায়গায় লিখেছেন – “পরস্পরকে কত ভালোই না বাসে গরিবেরা।”

উল্লিখিত, ‘ভ্রাতৃ সমাধি’র বর্ণনা সাধারণ সাইজের বইয়ের ১১ পৃষ্ঠা জুড়ে। আমাকে তা সংক্ষেপ করতে হল। কিন্তু উদ্ধৃতি কষ্টকিত। না হলে বিষয়টা পাঠক সমীপে হাজির করা আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল। নিম্নরেখগুলি আমার।

মাঝে মাঝে যে নিম্নরেখ তা আমার। তাতে আমরা বিপ্লবের কুশীলবদের দেখতে পাচ্ছি – শহীদ, নারী, রাস্তার হা ঘরে কাগজ বেচা বাচ্চারা, সোভিয়েত দেশের নতুন শাসন কর্তা ‘জার’ মানে জনতা, জনগণ, কোন জনগণ? গরিব মেহনতি, রুক্ষ অমার্জিত যারা, শক্ত সমর্থ গাঁড়াগোড়া প্রলিতারিয় নারী, লাল ময়দানে সমবেত পঞ্চাশ হাজার এমন সব মানুষ। যারা “লাল পতাকার এক নদী স্রোত, বহন করে চলল আশা আর ভ্রাতৃত্ব আর বিপুল এক ভবিষ্যতের বানী, পঞ্চাশ হাজার জনতার এক পটভূমির সামনে দিয়ে, বিশ্বের সমস্ত শ্রমিকজন ও তাদের অনন্ত বংশধরদের দৃষ্টির তলে”

পাঠক, আমরা জানি শুধু মস্কো ও সন্নিহিত শহরগুলিতে নয়। রাশিয়া ও পরে সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে যুক্ত হওয়া এশিয়া ভূখণ্ডের প্রদেশগুলিতেও, এক কথায় সমস্ত সোভিয়েত রাশিয়া জুড়েই সেই দুনিয়া কাঁপানো দশ দিনে ও তার পরবর্তী দিনগুলিতে, এমনকি কোথাও কয়েক বছর ধরে অনেক বীরত্বপূর্ণ লড়াই লড়েছিলেন, শহীদত্ব বরণ করেছিলেন জন রীডের বর্ণিত বিবিধ বর্গের মানুষের সঙ্গে কৃষকরাও।



৩

এই সব সরল – সুন্দর গরিব মানুষ, যাঁরা প্রতিকূল প্রতিবেশে নব সোভিয়েত ভূমি নির্মাণে নানাভাবে অংশ নিয়েছিলেন, তাঁদের প্রতি লেনিনের স্বাভাবিক পক্ষপাত ও নিবিড় ভালবাসা ছিল। যাঁরা

ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানভ লেনিনের প্রীতিময় সাহচর্য কোন না কোন ভাবে পেয়েছিলেন, অথবা সাক্ষাতে পান নি, পেয়েছিলেন চেতনার অনুভবে, তাঁদেরই কিছু কাহিনী শোনার আপনাদের। লেখার রসদ পেয়েছি ১৯৭৬ সালে প্রকাশিত, প্রগতি প্রকাশন-এর সের্গেই

আলেক্সেয়েভের লেখা রামধনু সিরিজের ‘রুশ ইতিহাসের কথা ও কাহিনী’ নামে চমৎকার একটি বই থেকে। অনুবাদক – অরুণ সোম।

কিন্তু, এর বাইরেও অনেক কাহিনী আছে। আমি সের্গেই আলেক্সেয়েভ যেমন দেখিয়েছেন, তেমন ভাবে আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করলাম। ভুল বললাম, তিনি যতভাবে লেনিনকে দেখিয়েছেন, ততো আমি এই নিবন্ধে দেখাতে পারলাম না। যাই হোক যা উপস্থিত করছি, অবশ্যই সংক্ষেপ করে, তাও অনেকের জানা। তবুও।

সমঝদার লোক

জমির ডিক্রি জারি করেছে সোভিয়েত সরকার। এক গ্রামে গরিব চাষিদের মধ্যে কুলাকদের দখলিকৃত জমি

ভাগবাঁটোয়ারা হবে সকাল বেলায়।

তার আগের রাতে এক চাষি আর তার ছেলের ঘুম আসছে না। ছেলে বলছে, উলিয়ানভ লেনিন খুব দয়ালু। বাবা বলছে – না তিনি সমঝদার মানুষ। কারণ, তিনি জানেন চাষিদের জমি ছাড়া চলবে না।

এক সময় ছেলেটি ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে, লেনিন এসে নিজে চাষিদের মধ্যে জমি বেঁটে দিচ্ছেন। আর সে হয়েছে তাঁর সহকারী।

ছেলেটির মনোবাঞ্ছা তাকে দিয়েই জমি বিলি শুরু হোক। কিন্তু লেনিন বললেন – তুমি বাঁটছো বলে তোমার পালা সবার শেষে।

জমি বাঁটা হচ্ছে। ছেলেটির পালা যখন এলো, তখনই তার ঘুমটা গেল ভেঙে।

এটা স্বপ্ন ছিল বুঝে সে আবার ঘুমিয়ে পড়ল, আর ঘুম ভাঙলে যখন ঘটনাস্থলে এলো, তখন ভাগ বাঁটোয়ার শেষ। তার বয়সীরা তাকে নিয়ে ঠাট্টা তামাসা করতে থাকল।

সে বলল, সে লেনিনকে দেখেছে। তিনি এখানে এসে নিজে জমি

বেঁটে দিচ্ছেন।

সবাই লেনিনের নাম জানে। কিন্তু তিনি যে এখানে আসেন নি, তাও সবার জানা। তাই তাদের তামাসা কমে না।

এই সময়, এলেন, গ্রামের বুড়ো মানুষ প্রজারভ। তিনি এসে সব শুনে বললেন, ইয়েরিওমকা, মানে ঐ ছেলেটা ঠিকই বলেছে। তোমরা ঠাহর করতে পারো নি, তোমাদের বোধ নেই। তাই দেখতে পাও নি।

মোড়ল

পেত্রগ্রাদের স্মোলনিতে কাস্ত্রমা প্রদেশের একদল চাষি এসেছেন লেনিনের সঙ্গে দেখা করতে।

তারা এলেন। আর ঠিক তখনই লেনিন ওঁদের পাশ কাটিয়ে চলছিলেন। লেনিনকেই ওরা জিজ্ঞাসা করলেন – আচ্ছা ভাই এখানকার মোড়ল কই?

লেনিন যখন অবাক হয়ে বললেন – আপনারা মোড়ল কাকে বলছেন।

তারা উত্তর – মোড়ল, যিনি এখন রাশিয়া চালান।

লেনিন একটু মজা করে বললেন – ঐ তো ওদিকে।

তারা নির্দেশিত দিকে যেতে আবার একজনের সঙ্গে দেখা। তাঁকেও সেই কথা বলাতে, তিনি বললেন – ঐ তো একটু আগে যাঁর সঙ্গে কথা বলছিলেন, তিনিই তো লেনিন।

কৃষকদের মুখ একেবারে হাঁ হয়ে গেল।

পরক্ষণেই সেই ব্যক্তি নির্দিষ্ট পথে তিন তলায় লেনিনের ঘরের সামনে পৌঁছে গেলেন।

সেক্রেটারি – আপনাদের দরকার কার কাছে, কার কাছে যাবেন, কোথা থেকে আসছেন এসব জিজ্ঞেস করায় বুড়ো আফানাসি দানিলোভিচ “নিজেদের সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে ভারি ক্লি চলে হুম হুম করল, গোর্ফ জোড়া হাতের চেটো দিয়ে ঘসে সোজা করে নিয়ে বলল – জানাও মোড়ল এসেছে – যে এখন রাশিয়া চালায়।”

একমত নই

তখন চারিদিকে অভাব, অন্নকষ্ট, হাহাকার।

জাভিদভকা গ্রামের চাষিরা সরকারের কাছে ফসল দিয়ে দেখলেন, তাঁদের কাছে বেশি নেওয়া হয়েছে। তারা লেনিনের কাছে যাবেন কি যাবেন না এই নিয়ে দোলাচলের মধ্যেও ‘ন্যায়’র জন্য লেনিনের কাছে গেলেন।

লেনিন কৃষকদের অভ্যর্থনা জানালেন আর সব কথা মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। তিনি একমত হলেন – হ্যাঁ খুব খারাপ সময় পড়েছে। এই দুঃসময় পাড়ি দেবার জন্য তিনি কৃষকদের সাহায্য চাইলেন।

কৃষকরা মনে করলেন, তাঁদের আর্জি নাকচ হয়ে যাবে।

কিন্তু লেনিন তো লেনিনই। তিনি ঐ গ্রামের সোভিয়েতের কাছে একটা চিঠি লিখে দিলেন। বললেন – আপনারা যে বাড়তি ফসল দিয়েছেন, তা ফেরত পাবেন।

তাদের চোখ-মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। ন্যায় বিচার পেলেন বলে। সেই সময় যে শ্রমিক ও কৃষকরা ক্রেমলিনে কাজ নিয়ে আসতেন, তাঁরা এখানেই খেয়ে যেতেন।

চাষিরাও সেখানে গেলেন। খেতে বসে চক্ষু তো চড়ক গাছ। এতো অভাবের মধ্যেও যে খাবার তাঁরা গ্রামে খান তার থেকেও নিকৃষ্ট মানের খাবার। “বাঁধাকপির সুরুয়া। খেতে গিয়ে দেখল একেবারে জলো, টকটক স্বাদ। মাংসের বদলে ভাসছে হেরিং মাছের কাঁটা ও চামড়ার দুয়েকটা কুচি।”

খাওয়া শেষে দেখলেন, লেনিনও এই পথেই আসছেন খেতে। ওঁরা অবাক হলেন – লেনিনও এই খাবার খাবেন!

লেনিন তাঁদের বললেন – আজকে নাকি জাউটা খুব সুস্বাদু হয়েছে।

চাষিরা এ কথায় থ মেরে গেলেন।

আবার তাদের মধ্যে ফসল ফিরে পাবার ন্যায় বিচারের কথা উঠল। খমুতোভ নামে একজন বললেন – আমি লেনিনের সঙ্গে একমত নই। এখানে আমরা ন্যায় বিচার পাই নি।

কেন না গ্রামে তো আমরা খাবার পাই। আর গণ-কমিশার ক্যান্টিনে এঁরা কী খান!

অতএব, লেনিনের সঙ্গে তিনি একমত নন।

এক, দো, তিন

লেনিন ভয়ানক কাজের চাপের মধ্যেও কখনও কখনও মোটর গাড়ি নিয়ে বনে চলে গিয়ে তার রম্য দৃশ্যাবলি দেখতেন।

এরকম একদিন বনে বেরিয়ে গরিব ঘরের ছোট এক মলিন মেয়ের সঙ্গে দেখা হলো তাঁর। সে বনে এসেছে বাদামের খোঁজে, এসেছে ব্যাঙের ছাতা কুড়োতে আর এসেছে। কিন্তু কিছুই পায় নি, অব্বোর ধারায় কাঁদছে।

লেনিন নিমেষেই তার আপনার জন্য বন্ধু হয়ে গেলেন, আর যাদুকরের মতো অভিনয় করে এক দো তিন বলে বলে প্রথমে বাদাম, তারপর ব্যাঙের ছাতা জোগাড় করে দিলেন তাকে। তার ঝুড়ি ভরে গেল। ঐ এক দো তিন শব্দবন্ধ উচ্চারণ করে মোটর গাড়িতে তুলে মেয়েটিকে, তার গ্রামে পৌঁছে দিলেন।

মেয়েটির নাম ভারিয়া। সে ফিসফিস করে বলল – কী মজার লোক!

মানহানি

তরপগিন নামে যুবক গ্রাম থেকে মস্কোয় এসেছে। সে ঠিক করল ক্রেমলিনে যাবে। এবং গেল সেখানে। চুল দাড়ি কাটাতে হয়। সে সময় ওখানে একটা ছোটখাটো সেলুন ছিল। সে ভাবলো এখানে এই কর্মটি করলে মনে রাখার মতো ব্যাপার হবে তা।

একটু পরে ওখানে লেনিন এলেন, ঐ একই কাজে।

লেনিনই তার জড়তা ভাঙিয়ে গল্প শুরু করলেন। গ্রামের সব খবরাখবর নিলেন। তারপর এক সময় ছেলেটির পালি এলো।

সে বলল লেনিনকে আপনি আগে যান। কিন্তু তিনি কিছুতেই তা করলেন না।

সে গ্রামে এসে বলল সেসব কথা।

গ্রামের সবার এক কথা, সে লেনিনের মানহানি ঘটিয়েছে। সেজন্য সবার সর্বসম্মত বিচারে সাব্যস্ত হল – তাকে যে গ্রাম সোভিয়েতের সদস্য করার কথা হচ্ছিল, তা তারা নাকচ করে দিল। কারণ, সে লেনিনকে জায়গা ছেড়ে দেয় নি।

নতুন বুটজোড়া

কাতিয়া নামে একটা মেয়ে বার্তাবহের কাজ করত।

একদিন দপ্তরের পরিচালক একটা কাগজপত্রের প্যাকেট তাঁর হাতে দিয়ে, তা ফ্রেমলিনে লেনিনকে দিয়ে আসতে বললেন।

এখানে ওখানে হরদম যেতে আসতে তাঁর বুট জোড়া একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু কিছু করারও নেই। সে সময় চলছে জুতোর খুব টানাটানি।

ক্ষয়ে যাওয়া জুতো পরে লেনিনের কাছে যেতে তাঁর মন চায় না। কিন্তু যেতে তো হবেই। গেলেন কাচুমাচু হয়ে। সব সময় সাবধানতা, লেনিন যেন তাঁর বুট জোড়া দেখতে না পান।

লেনিনকে কাগজপত্র দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চলে আসতে উদ্যত হতেই লেনিন তাঁর কাছ থেকে, কত দিন হল তাঁর কাজের, তাঁর পরিবার-পরিজন, লেখাপড়া ইত্যাদির কথা জানতে শুরু করলেন।

কাতিয়া ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিয়ে ভাবলেন – যাক লেনিন তাঁর জুতো জোড়া দেখতে পান নি।

কিন্তু লেনিন কাতিয়ার অফিসের পরিচালককে বলে তাঁর নতুন জুতো জোড়ার ব্যবস্থা করে দিলেন।

কাতিয়ার মনে হল পরিচালকই তাঁর নতুন জুতোর বন্দোবস্ত করলেন।

চমৎকার দিন

গত কয়েক মাস ধরে কাজের চাপে লেনিন শিকারে বেরোতে পারেন নি। এবার কনস্তুতিনেভার কাছে বিদায় নিয়ে বনের দিকে

রওয়ানা দিলেন।

গ্রামবাসীদের সঙ্গে তাঁর দেখা হবে, আর সোভিয়েত কেমন চলছে তা নিয়ে গল্প জুড়ে দিচ্ছেন।

চারিদিকে খবর রটে গেল, যে গ্রামে লেনিন এসেছেন।

এ গ্রাম ও গ্রাম থেকে তাঁর কাছে অনুরোধ আসছে, সেখানে যাবার জন্য। লেনিন সেসব গ্রামে যাচ্ছেন আর গ্রামবাসীদের সঙ্গে আলোচনায় মেতে যাচ্ছেন।

পাশের এক গ্রাম থেকে অনুরোধ এলো – লেনিন যেন সেখানে যান।

তাঁর সঙ্গী বলছেন – লেনিনকে বিশ্রাম নিতে হবে। উনি শিকারের আনন্দ নেবেন। কে শোনে কার কথা। না শোনে লেনিন, না গ্রামবাসীরা।

লেনিন শিকার বাদ দিয়ে সেই গ্রামে এলেন এবং যথারীতি আলোচনা চলতে থাকল।

নাজেদদা মস্কোতে ভাবছেন, যাক লেনিন একটু বিশ্রাম নিতে পারছেন।

তিনি অপেক্ষা করছেন লেনিনের জন্য। ফিরে আসা উদ্দীপিত লেনিনকে দেখে বললেন – “ভলোদিয়া আজকের দিনটা কী সুন্দর! তাই না?”

“–চমৎকার! লেনিন উত্তর দিলেন।”

পুরোনো ফটক

পুরোনো ফটকপল্লীর সমস্ত

কিছু লকলকে আঙনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। কুঁড়ে ঘর, কোদাল, টেবিল, আইকন, ঘোড়ায় টানা গাড়ি, স্নেজগাড়ি, শস্যের গোলা। সব থেকে দুশ্চিন্তার কথা সব শস্য পুড়ে গিয়েছে।

কী করা যায়? আশেপাশে কোন বন নেই, ঘরে নেই পেরেক, গোলায় নেই খাবার।

অতএব, সন্দেহ সংশয় নিয়ে শেষ পর্যন্ত ঠিক হল, যাওয়া হবে লেনিনের কাছে।

যাওয়া হল। সব শুনলেন তিনি। লেনিন সর্বপ্রথম আকুল হলেন শিশুদের জন্য। যখন শুনলেন আশেপাশের গ্রামে তাদের রাখা হয়েছে, তখন আশ্বস্ত হলেন।



লেনিন অতঃপর কী কী করা যায়, আর কিভাবে করা হবে, তা বলছেন গ্রামবাসীদের। গ্রামবাসীরা ধন্য ধন্য করছেন।

প্রত্যুত্তরে লেনিন বলছেন – “আরে এসবের কোনো দরকার নেই। এটা আমার কর্তব্য। আপনাদের ইচ্ছায় আপনাদের কাছে যেমন, তেমনই শ্রমিক-কৃষকের শাসনের কাছে এই কর্তব্যে বাঁধা।”

লেনিনের ব্যবস্থাপনায় পুরোনো ফটক পল্লী নতুন করে গড়ে উঠল।

“এক মাস না যেতে গ্রাম আবার জনবসতিপূর্ণ হয়ে পড়ল। দাঁড়িয়ে রয়েছে নতুন পল্লী। সুন্দর সারি সারি কুটির শোভা বর্ষণ করছে।”

কুটিরগুলির সামনে কৃষকরা বলাবলি করেন, এখন তো পুরোনো ফটক পল্লী একেবারে নতুন। তা হলে এর নাম বদল হওয়া দরকার। কেউ বলে নয়া ফটক, কেউ বলে উজ্জ্বল ফটক। কিন্তু শেষে সাব্যস্ত হয় এই পল্লীর নাম হবে ‘লেনিন ফটক’।

হার-জিৎ

লিওনকা স্নান করছিল। এমন সময় লেনিন সেখানে হাজির হলেন।

ছেলেটি সাঁতার কাটছে। তাকে লেনিনের বেশ ভালো লেগে গেল। এবং তিনি বললেন তাকে – এসো দুজনে সাঁতার কাটি। হার-জিৎ হয়ে যাক।

ছেলেটি একপায়ে রাজি।

সে সাঁতার কাটে। ভলগায় সাঁতার কাটা দক্ষ লেনিনও সাঁতার কাটেন। এক পর্যায়ে ছেলেটি জিতে যায়।

তাদের সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে। আর সে শক্তি নেই। – এই খেদ নিয়ে লেনিন বাড়ি ফিরলেন।

ওদিকে লিওনকা নিজ এলাকা গর্কিতে ফিরে জাঁক করে গল্প করতে লাগে, সাঁতারে এক, শহুরে খুড়েকে সে হারিয়ে দিয়েছে।

পরাজিতের অবয়বের বর্ণনা শুনে সবাই বলে উঠলেন – উনি খুড়ো নন। উনি লেনিন।

লিওয়ানকার তো মুখ হাঁ হয়ে গেল।

এই ‘ক্রটি’ শুধরানোর জন্য সে তক্কে তক্কে থাকে। এক সপ্তাহ পর লেনিনের সঙ্গে তার সেখানেই দেখা হয়।

দু’জনে আবার সাঁতার প্রতিযোগিতায় নামেন।

এবার লিওনকা সাঁতারে সব সময় লেনিনকে পেছনে থাকে। লেনিন ধীরে ধীরে সাঁতার কাটলেও সে পেছনেই থাকে। এক সময় লেনিন সাঁতার খামিয়ে দিলে সেও খামিয়ে দেয়। লেনিন পরীক্ষা করে বুঝে নেন – সে ইচ্ছা করে এমন করছে। লেনিন তার চালাকি বুঝে ফেলেছেন।

লেনিনের কথা মতো আবার তারা জলে নামে। এবার লিওনকা প্রাণপনেই সাঁতার কাটলো। কিন্তু সে হেরে গেল।

এবার “লেনিন খুশিমনে বাড়ির দিকে চললেন আর বললেন – তাহলে, আমাদের হার মানার মতো কিছু হয় নি। তাহলে আমরা

এখনও লড়ার ক্ষমতা রাখি

ভ্লাদিমির ইলিচ মেঠোপথ দিয়ে চলেন আর মনে মনে বলেন – এটা তো রীতিমতো চমৎকার। তা হলে বিশ্রাম শেষ করা যেতে পারে। ভাঁড়ারে এখনও বারুদ আছে।”

“এদিকে বিভ্রান্ত লিওনকা কোনো মতে বাড়ি ফিরল। যদিও, ও যা চেয়েছিল তা-ই হল – লেনিনকে তো এগিয়ে যেতে দিয়েছে!”

স্টে-পা-আন মার্কেলিচ

শিকারে স্তেপান মার্কেলিচ লেনিনের পথ প্রদর্শক। ঘণ্টাখানেক আগে ওঁর সঙ্গে লেনিনের ছাড়াছাড়ি হয়েছে। কথা ছিল পুরনো এলম গাছটার নিচে তাদের দেখা হবে।

এখানে নেই। তবে! স্তেপান খুঁজতে বেরলেন। বনাঞ্চল বিদীর্ণ করে ডাক – ভ্লাদি – দি – মির লেনিন। লেনিনও তাঁকে খুঁজছেন। তবে, অন্যদিকে। ডেকে চলেছেন – স্তে – পা – আন মার্কেলিচ – স্তে – পা – আন মার্কেলিচ।

বুড়ো চলে যাবার কিছুক্ষণ পর লেনিন এলম গাছের তলায় এলেন। না, স্তেপান তো আসেন নি।

স্তেপান জানেন, লেনিনও জানেন পরস্পরকে, সমানুভূতি হিসাবে। তা হলে কী হল!

দু’জনই খুঁজতে লাগলেন উৎকণ্ঠা নিয়ে। দেখা হয় একটা জায়গায়। লেনিন উৎকণ্ঠার কথাটা চেপে গিয়ে বলেন বনের দৃশ্যাবলি দেখবার কথা। আর স্তেপান বলেন – কাঠবেড়ালি দেখতে দেখতে বেখেয়াল হওয়ার কথা।

কিন্তু স্তেপান সত্য কথাটা অর্থাৎ উদ্ভিন্ন হবার কথাটা বলেই ফেলেন।

লেনিন হেসে উঠেন।

স্তেপান ভাবেন – কী ব্যাপার উনি হাসেন কেন? তিনি তো কোন হাসির কথা বলেন নি।

আসলে লেনিন তো তাঁর নিজের উদ্ভিন্ন হবার কথাটা এই হাসির মধ্য দিয়ে বলে দিলেন।

তরমুজ

মিশাংকা আর রোদকা পড়শি। দুই কিশোর বন্ধু। ওরা নিজ নিজ জমিতে অনেক কসরত করে বিরাট বিরাট তরমুজ ফলিয়েছে।

ওদের বাসনা লেনিনকে তা উপহার দেয়। ওরা জানে না কতদূর মস্কো এই গ্রাম থেকে। হাজার ভার্সের পথকে ওরা মনে করে ২০ ভার্স। সেই মতো সঁকা রুটি, চর্বি আর ২ টি ডিমের জোগাড় করে ভাঁড়ার থেকে সরিয়ে। ধরা পড়ে যায়।

কিন্তু গ্রামবাসীরা বলেন – খুব ভালো হবে লেনিনকে এই উপহার দেওয়াটা।

তাঁরা সব ব্যবস্থা করে তাদের লেনিন সমীপে পাঠান।

লেনিন স্তেপের ফল দু’টির খুব তারিফ করেন। মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখেন।

কিন্তু ছেলে দু'টির ইচ্ছা, কার তরমুজটা বেশি মিষ্টি এটা লেনিন পরখ করে বলুন। কিন্তু লজ্জায় সে কথা বলতে পারে না। গ্রামে গিয়ে চিঠি লেখার কথা ভাবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত লেখা আর হয় না।

“না লিখে ভালোই করেছে। লিখলে ভ্রাদিমির ইলিচ ছেলেদের কাছে কী জবাবটা দিতেন? তিনি যে তরমুজ চেখেও দেখেন নি! লেনিনের মনে পড়ে গেল অন্য বাচ্চাদের কথা। তরমুজ দুটো লেনিনের বেশ মনে ধরেছিল, তাই ত তিনি ও দুটোকে শ্রমিক অঞ্চল খামোভনিকির অনাথ আশ্রমে পাঠিয়ে দিলেন।”

ভুণ্ডুলে

একবার লেনিন একটা চিঠি পেলেন। এক গ্রামের কৃষকরা তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে লিখেছে – এবার বিপ্লব বার্ষিকী উপলক্ষে অক্টোবর মাসে তাঁকে উপহার পাঠাবেন তাঁরা।

উপহার এমন কিছু নয়, মাংস ও চর্বি টুকরো।

চাষীদের প্রস্তাবে বাদ সাধল প্রাক্তন লালফৌজী, বুদ্ধিগ্নি বাহিনীর সেলিভের্ত দুবৎসব।

তার আপত্তির উত্তরে সমস্বরে বললেন – কেন লেনিন কী মানুষ নন। তাঁর কী খাবার দরকার নেই।

কিন্তু প্রাক্তন লালফৌজী, যাকে সবাই ‘ভুণ্ডুলে’ নাম দিয়েছে, কারণ সব কাজেই বাধা দেন – সেজন্য। তিনি কৃষকদের কাছে প্রস্তাব রাখলেন – গাঁহতি, কোদাল হাতে নিয়ে এক্ষুণি গাঁ পর্যন্ত একটা নয় ভাস্টের রাস্তা তৈরি করতে হবে। তাতে লেনিন খুশি হবেন।

প্রথমে সবাই হেসে সেই প্রস্তাব বাতিল করে দিলেন। কিন্তু একজন দোনোমনো করে বললেন – মনে ভুণ্ডুলের প্রস্তাবটা ভালো। এতে লেনিন খুশি হবেন।

সবাই সেই প্রস্তাব মেনে নিয়ে “চাষির ঘরের মেয়েদের জড় করল, বুড়াদের চুল্লির আরামদায়ক চুল্লি থেকে টেনে তুলল – লেগে পড়ল কাজে। ঠিক অক্টোবর উৎসব নাগাদ সব তৈরি শেষ। এমন কি কামেনকা নদীর ওপর সেতুও পাতা হয়ে গেল।”

কৃষকরা অক্টোবর উৎসব উপলক্ষে লেনিনকে অভিনন্দন জানিয়ে রাস্তার কথা জানালে তিনি খুব খুশি হলেন। তিনি গ্রামবাসীদের চিঠি লিখলেন। চিঠির শেষ লাইন – “নয় ভাস্টের এই পথ কমিউনিজমের পথে দেশের আর এক পা বাড়ানো।”

কৃষকরা স্বভাবতই খুব খুশি। তারা মে দিবস উপলক্ষে আর একটা এমন উপহার দেবেন বলে ঠিক করলেন।

লেনিনের জমি

বাবুদের জমি ভাগাভাগির সময় একজন মনে করিয়ে দিলেন, লেনিনের নামেও জমির একটা ভাগ রাখতে হবে।

চাষিরা একটা দোআঁসলা ভালো জমি বন্দোবস্ত করে লেনিনকে চিঠি লিখলেন – তোমার জন্য জমি রাখা হয়েছে। তুমি এসে চাষের বন্দোবস্ত কর।

লেনিন জানালেন – তার দিকে মনোযোগ দেবার জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু জমি দেখার সময় তাঁর নেই। গ্রামবাসীরা যেন বিবেচনা করে একটা ব্যবস্থা করেন।

চাষিরা ঠিক করলেন, সেটা দেশের জমি হবে। সবাই মিলে চাষ করবে। আর ফসল সার্বজনীন গোলায় রাখা হবে।

কারো ফসল ভালো হয়নি। উপোষ দিতে হচ্ছে। তাকে সেই গোলার ফসল দেওয়া হল। কারো ঝাড়াইয়ের মেশিন নেই। তাকে ফসল বেচে টাকা দেওয়া হল।

একবার সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিয়ে সেই জমির ফসল বস্তা ভরে শ্রমিকদের উপহার হিসাবে পাঠালেন। লিখলেন – “ফসল হেলাফেলার নয় – লেনিনের জমির।”

ইতোমধ্যে দশ বছর কেটে গেল। গ্রামে যৌথ খামার গড়ে উঠল। জমি আর পশুপাল সাধারণের সম্পদ। লেনিনের জমিটা যথারীতি যৌথ খামারের মধ্যে পড়ল। কিন্তু কেউ তার কথা ভুললো না। কারণ “জনগণের স্মৃতি অনন্ত।”

“এ জায়গার ওপর দিয়ে ঘোড়সয়ারই যাক আর পথচারীই যাক – সকলেই ক্ষণিকের জন্য থামবে। লেনিন যে কারও চোখে পড়ে যাবেন।”

“জমি থেকে ভাপ ওঠে, বাতাসে গমের শীষ মাথা নাড়ে – লেনিন চলাচল করছেন প্রান্তরের ওপর দিয়ে, চলেছেন যৌথ খামারের জমির ওপর দিয়ে।”

গোপন অনুরোধ

শ্রমিক ও কৃষকরা লেনিনকে মাঝে মাঝে নানা রকম পার্সেল উপহার পাঠাতেন। লেনিন খুব বিব্রত হতেন। সঙ্গীরা এসবকে শ্রদ্ধার স্মারক হিসাবে দেখবার অনুরোধ জানালে তিনি বলতেন – না এসব চলতে পারে না। এসব পুরোনো সামন্ততান্ত্রিক প্রথা। এসব চলবে না।

মহান অক্টোবর বিপ্লবের পঞ্চম বার্ষিকী উপলক্ষে এক কাপড় কলের চারশ মজুর স্বাক্ষর করে এক খণ্ড কাপড় তাঁকে পাঠালেন। লেনিন আসন্ন উৎসবের জন্য কোন কড়া কথা না বলে লিখলেন – “প্রিয় কমরেড!

আপনাদের অভিনন্দন ও উপহারের জন্য আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। একটা গোপন কথা বলে রাখি যে আমাকে উপহার পাঠানো সঙ্গত নয়। আমার অনুরোধ, এই গোপন অনুরোধটি সব শ্রমিকদের ভালো করে জানিয়ে দেবেন

আপনাদের

ভ. উলিয়ানভ (লেনিন)”

শ্রমিকরা সেই চিঠি পেয়ে বললেন – “সুন্দর চিঠি আন্তরিক, কৃতজ্ঞতাপূর্ণ।”

কিন্তু লেনিনের অনুরোধকে সামরিক হুকুম বলে মনে নিলেন তাঁরা। এই খবরটা কাপড় কল যে জেলায়, সেই জেলায় প্রথমে ছড়িয়ে পড়ল।

ঐ স্মৃতি কালের এক শ্রমিক গ্রামে এসে সেই কথাটা জানালো। কৃষকদের উপহার পাঠানোর যে কথা ছিল তা বাতিল হল।

সেই গ্রামে এক লালফৌজী ছুটি কাটাতে এসেছিলেন। তিনিও সামরিক ছাউনিতে ফিরে গিয়ে সেই কথাটি সবাইকে বললেন। এভাবে এলাকা থেকে নতুন নতুন এলাকায় ছড়িয়ে গেল লেনিনের গোপন অনুরোধ।

কিন্তু তাতে উপহার পাঠানো বন্ধ হল না।

তা হলে ব্যাপারটা কী দাঁড়ালো “বোঝা মুশকিল। রাশিয়া খুব বড় দেশ কিনা। হয়ত সকলে ঐ অনুরোধের কথা জানতে পারে নি। হয়ত বা অন্য কোন কারণ”

স্মৃতিস্তম্ভ

সাইবেরিয়ার কোন এক জায়গা থেকে কৃষকরা এসেছেন লেনিনের কাছে প্রস্তাব নিয়ে যে তাঁরা তাদের গ্রামে লেনিনের নামে একটা স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি করার জন্য মনোরম একটা জায়গা নির্ধারিত করে, স্তম্ভ তৈরি করার পাথরের ব্যবস্থাও করে ফেলেছেন। তাঁরা লেনিনের অনুমোদন চান।

কুশলাদি বিনিময়ের পর লেনিন একথা শুনে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলেন, তিনি তার বিরোধী। অতএব তা হবে না।

গ্রামে ফিরে এসে এই কথা বলায় সবাই খুব মুষড়ে পড়েন। কিন্তু লেনিন ঠিক কথাই বলেছেন – এটাই সাব্যস্ত হয়।

তা হলে এই পাথর দিয়ে কী করা যায়? সিদ্ধান্ত হয় – ঐ জায়গায় এমন একটা স্কুল তৈরি করা হবে, যা হবে সবার ঈর্ষার বিষয়।

যেমন চিন্তা তেমন কাজ।

“ছেলে মেয়েদের খলখল হাসিতে চারদিক মুখরিত।”

“বছর যায়, একের পর এক। জীবন আর ঘটনা অতীতের গর্ভে মিলিয়ে যায়।

কিন্তু ইস্কুল থেকে যায়।

সাইবেরিয়ার পল্লীতে থেকে যায় লেনিনের চিরন্তন স্মৃতিস্তম্ভ।”

কমরেড লেনিন কোথায় জন্মেছিলেন?

হাটের ভিড়ে বিশাল তর্ক, লেনিন কোথায় জন্মে ছিলেন তা নিয়ে।

উরাল, এই হাট যে জেলায় সে জেলারই কোথাও, সাইবেরিয়ায়, পত্রগ্রাদ মানে পুরোনো সেন্ট পিটার্সবুর্গ, মস্কো, তুলা, কুর্স্ক অঞ্চলের

গ্লুখভ শহর, তামভর, অরিয়ল, পেনজা, ইয়েলসিনা – এরকম নানা স্থানের নাম উঠে আসে। তর্ক হয় তিনি জন্মেছিলেন কোথায় গাঁয়ে না শহরে। তর্ক আর শেষ হয় না।

নিজেরা তর্কাতর্কি করে যখন নাস্তানাবুদ হয়ে যান, তখন হাতে আগস্তকদের ধরে ধরে জিজ্ঞেস করতে থাকেন।

তাঁরা একজন এক এক রকম কথা বলেন।

একজন বলেন – লেনিনের জন্ম পাহাড়ি অঞ্চলে, কারণ তিনি বাজ পাখির মত দেখতে পান।

আরেকজন বলেন – তাঁর জন্ম স্তেপ এলাকায়, সেজন্য লেনিনের বিস্তার স্তেপেরই মত।

আরেকজন বলেন – লেনিনের জন্ম কোনো বনভূমিতে। সেজন্যই তিনি এতো মজবুদ।

“কৃষকদের মাথা একেবারে ঘুলিয়ে যায়।”

তাঁরা তখন গ্রাম সোভিয়েতের সভাপতির কাছে যান।

তিনি মূদু হেসে উত্তর দিলেন – “কমরেড লেনিন জন্মেছিলেন সিমবিস্কে। বিরাট চওড়া, বিশাল ঢেউ তোলা নদী ভলগার পাড়ে।

‘তারপর একটু ভেবে আবার কৃষকদের দিকে চেয়ে বললেন :

“তবে কমরেড, আসলে আপনাদের মধ্যে তর্কের কিছুই নেই।

লেনিন আমাদের দেশে – রাশিয়ায় জন্মেছিলেন।”

পাঠক, আমরা পেলাম অনুভাবী লেনিনকে, পেলাম শিশুর মত সরল লেনিনকে, পেলাম মেহনতি-দরদি, শ্রমিক-কৃষকের আত্মার-আত্মীয় লেনিনকে। পেলাম আদর্শে অমলিন, কিন্তু শ্রেণির মানুষের প্রতি দরদি লেনিনকে। পেলাম রাশিয়ার রূপকার লেনিনকে।

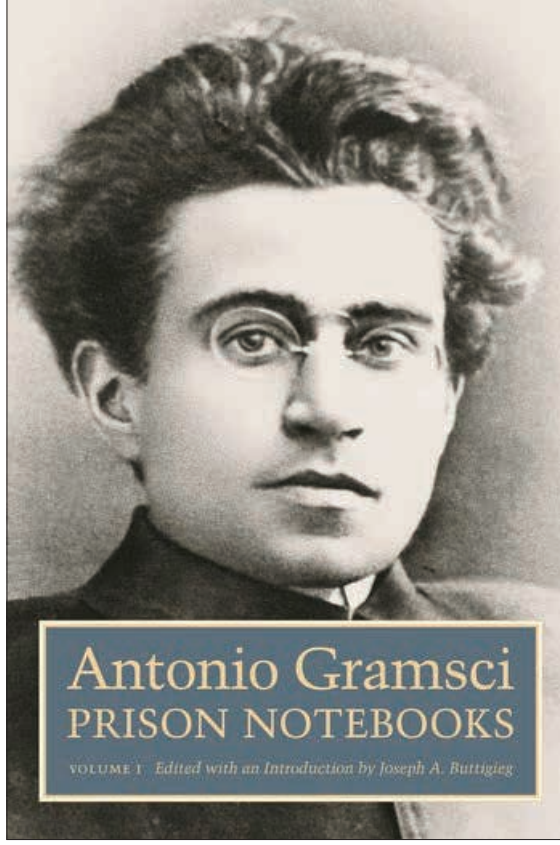
শুধু গ্রাম সোভিয়েতের সভাপতির কথাটার সঙ্গে আমরা একমত হতে পারলাম না। যখন তিনি লেনিনের জন্মস্থান নির্ধারণ না করতে পারা নাজেহাল কৃষকদের প্রশ্নের উত্তরে জানালেন – “কমরেড লেনিন জন্মেছিলেন সিমবিস্কে। বিরাট চওড়া, বিশাল ঢেউ তোলা নদী ভলগার পাড়ে।

“তারপর একটু ভেবে আবার কৃষকদের দিকে চেয়ে বললেন :

“তবে কমরেড, আসলে আপনাদের মধ্যে তর্কের কিছুই নেই।

লেনিন আমাদের দেশে – রাশিয়ায় জন্মেছিলেন।”

আমাদের কথা – লেনিন জন্মেছিলেন আমাদের এই গ্রহে। সমস্ত পৃথিবীই তাঁর জন্মস্থান।



গ্রামশির জেল ডায়েরি ও লেনিন

স ত্য জি ৭ বন্দ্যো পা ধ্যা য

১২৬-এর ৩১ অক্টোবর একটি ১৫ বছরের কিশোর আন্তিও জাম্বোনি বোলোঙ্গা শহরে মুসোলিনিকে হত্যার চেষ্টা করে। এই সুযোগে গোটা ইতালি-তে প্রবল ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাস নামিয়ে আনা হয়। নেপলস-এ বিখ্যাত দার্শনিক বেনেদেত্তো ক্রোচের বাড়িও আক্রান্ত হয়। ৫ নভেম্বর, ১৯২৬, ইতালির মন্ত্রীসভার মিটিং-এ বোলোঙ্গার ঘটনাটিকে সামনে রেখে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার ওপর চরম আঘাতটি নামিয়ে আনা হয়। সমস্ত পাসপোর্ট বাতিল করা হয়। কেউ বেআইনি ভাবে সীমান্ত পেরতে গেলে তাকে গুলির নির্দেশ দেওয়া হয়। সমস্ত ফ্যাসিস্ট বিরোধী সংবাদপত্র নিষিদ্ধ কোরে

দেওয়া হয়। সকল দল ও সংগঠন নিষিদ্ধ কোরে দেওয়া হয়। প্রতিবাদের সমস্ত রাস্তা বন্ধ কোরে দেওয়া হয়। নতুন আইন এনে মৃত্যুদণ্ড চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ও এর জন্য বিশেষ আদালত বানানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ৯ নভেম্বর, ১৯২৬, পার্লামেন্টে এই আইন পাশ করাবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কমরেডরা অনেকে চাইলেও গ্রামশি দেশ ছাড়তে চাইছিলেন না। কারণ তাহলে শ্রমিকদের মধ্যে তার খারাপ প্রভাব পরবে। গ্রামশি চাইছিলেন, শ্রমিকরা যখন বুঝতে পারবেন যে তার বাইরে চলে যাওয়াটা যুক্তিসম্মত তখনই তিনি যাবেন। গ্রামশি আরও চাইছিলেন: ৯ নভেম্বরের পার্লামেন্টের আধিবেশনে যোগ

দিয়ে আইনটির বিরোধিতা করতে। তখনকার ইতালির আইন অনুসারে পার্লামেন্টের সদস্যদের গ্রেফতার করা যেতনা। তিনি তখনও নিশ্চিত ছিলেন যে, তাকে ঐ আইনের কারণেই গ্রেফতার করা হবেনা। ৬ নভেম্বর ফ্যাসিস্ট দৈনিক IL TEVERT তার প্রথম পাতায় রোবার্তো ফেরিনাক্কি-র একটি প্রস্তাব ছাপল: পার্লামেন্টারি ডিউটিগুলিকে গুরুত্ব না দেবার জন্য পার্লামেন্টের অ্যাভেনটাইন সেশন পর্যন্ত সমস্ত বিরোধী ডেপুটিকে বহিস্কার করা হোক। ফেরিনাক্কি ছিলেন গ্রান্ড কাউন্সিল অফ ফ্যাসিজম-এর সদস্য ও ন্যাশনাল ফ্যাসিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক। কিন্তু কমিউনিস্ট ডেপুটীরা অনেক আগে থেকেই মন্ট্রিটোরিও-তে ডেপুটীদের কক্ষে তাদের আসন দখল কোরে বসেছিলেন। তাছাড়া IL TEVERT-র তালিকায় কমিউনিস্ট ডেপুটীদের নামও ছিলনা। গ্রামশি কমিউনিস্ট ডেপুটীদের সঙ্গে ৮ নভেম্বর, ১৯২৬, সন্ধ্যায় মন্ট্রিটোরিও-তে একটি সভায় মিলিত হলেন ও সেই সভায় পরের দিন মৃত্যুদণ্ড ফিরিয়ে আনার আইনের বিরুদ্ধে পার্লামেন্টে বক্তব্য রাখার জন্য এঞ্জিও রিবোলদি-কে দায়িত্ব দেওয়া হল। ৮ নভেম্বর রাত ৮-টার সময়ে মুসোলিনি প্রধানমন্ত্রীর আবাস প্লাজ্জা চিগিতে রোবার্তো ফেরিনাক্কি ও অগুস্ত তুরাতি-কে ডেকে পাঠালেন ও তাদের জানিয়ে দিলেন, কমিউনিস্ট ডেপুটীদের নামও উক্ত তালিকায় যুক্ত করতে হবে। ফেরিনাক্কি মুসোলিনিকে বলেছিলেন : তিনি এই তালিকা তৈরি করেছেন কারা পার্লামেন্টের কাজকে উপেক্ষা করছে তার ভিত্তিতে। বাস্তবে কমিউনিস্ট ডেপুটীরা পার্লামেন্টের কাজকে উপেক্ষা করতেনও না। মুসোলিনি উত্তর দিয়েছিলেন : রাজা তাই চান। গ্রামশি শেষ মুহূর্তের এই পরিবর্তনের কথা জানতে পারেননি। কমিউনিস্ট ডেপুটীদের সঙ্গে সভার পরে তিনি মন্ট্রিটোরিও থেকে পোর্টা পিয়া-তে তার তখনকার বাসস্থলে চলে যান। রাত সাড়ে দশটার সময়ে তাকে সেখান থেকে গ্রেফতার করা হয় (৮ নভেম্বর, ১৯২৬)। যদিও তিনি তখনও পার্লামেন্টারি ইমিউনিটি সুরক্ষার আওতায় ছিলেন।^১ গ্রামশির বিচারের সময়ে পাবলিক প্রসিকিউটর দাবী করেছিলেন : 'For twenty years we must stop that brain from working'। বিচারক তাকে কুড়ি বছর কারাবাসের নির্দেশ দিয়েছিলেন।^২

গ্রামশির জেল ডায়েরি

ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্র কিন্তু তার চিন্তা-ক্ষমতাকে পুরোপুরি ধ্বংস করতে পারেনি। তবে শারীরিকভাবে তাকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে গিয়েছিল। ১৯৩৫-এর আগস্টে তার যথাযথ চিকিৎসার জন্য তাকে রোমের একটি ক্লিনিকে নিয়ে আসা হয়। তখন তিনি 'arterio-sclerosis, tubercular infection, pulmonary tuberculosis, high blood pressure, angina, gout and acute gastric disorder'-এ আক্রান্ত। এই অবস্থায় তার কারাবাসের মেয়াদ দশ বছর কমিয়ে দেওয়া হয়। সেই হিসেবে তার কারাবাসের মেয়াদ শেষ হয় ১৯৩৭-এর ২১ এপ্রিল। তখনও তিনি ক্লিনিকে চিকিৎসাধীন। ঐ ক্লিনিকেই ২৭ এপ্রিল তার জীবনাবসান হয়।^৩ বিপুল শারীরিক

ও মানসিক যন্ত্রনার সহ্য করতে করতেও তিনি যে জেল ডায়েরি লিখেছিলেন তা ছিল ২৮৪৮টি পৃষ্ঠা সম্বলিত ও ৩২টি নোটবইতে লিপিবদ্ধ।^৪ গ্রামশি একজন মৌলিক মার্কসবাদী চিন্তাবিদ হিসেবে তার জেল ডায়েরিতে যেসব বিষয়গুলিকে কেন্দ্র কোরে তার তাত্ত্বিক বর্ণালী নির্মাণ কোরে তুলেছিলেন তার মধ্যে রয়েছে হেজিমনি (মতাদর্শগত আধিপত্য), ওয়ার অফ পোজিসন (অবস্থায়ী সংগ্রাম), ওয়ার অফ মুভমেন্ট (চলিষ্ণু সংগ্রাম), প্যাসিভ রেভোলিউশন (নিষ্ক্রিয় বিপ্লব), ফোর্ডইজম, কমন সেন্স ও আরও কয়েকটি ধারণা। আমরা বর্তমান আলোচনায় বুঝে নেবার চেষ্টা করব, গ্রামশি তার মতাদর্শগত আধিপত্যের ধারণাকে ধারণাকে কীভাবে নির্মাণ কোরে তুলেছিলেন। সেইসঙ্গে তার পূর্বসূরী হিসেবে লেনিনের তত্ত্বভাবনাকে তিনি কীভাবে আত্মীকৃত করেছিলেন ও তাকে বিকশিত কোরে তুলেছিলেন। আবার এই কথাও মনে রাখা দরকার, তার হেজিমনি বা মতাদর্শগত আধিপত্যের ধারণার সঙ্গে ওয়ার অফ পোজিসন (অবস্থায়ী সংগ্রাম), ওয়ার অফ মুভমেন্ট (চলিষ্ণু সংগ্রাম), প্যাসিভ রেভোলিউশন (নিষ্ক্রিয় বিপ্লব) ইত্যাদি ধারণাগুলিও অবিচ্ছিন্ন।

'অর্থনীতিবাদের' সমালোচনা

গ্রামশি যে মার্কসীয় পরম্পরার মধ্যে দিয়ে একজন মিলিট্যান্ট হিসেবে বিকশিত হয়ে উঠেছিলেন, সেই পরম্পরা ধনতন্ত্রের বিকাশ ও গতিধারা এবং ধনতন্ত্রের সংকট ও রাজনৈতিক রূপান্তরগুলিকে আগাম বুঝে নেবার ক্ষেত্রে গভীর প্রজ্ঞার পরিচয় রেখেছিল। কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রকরণগুলির বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা ও সামাজিক শ্রেণীসমূহ ও রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের সম্পর্ক বিষয়ে আলোচনা উক্ত পরম্পরার মধ্যে স্পষ্টভাবে আসেনি। বিভিন্ন সামাজিক দ্বন্দ্বের বিরুদ্ধে কোন রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত প্রকরণের ভিত্তিতে লড়াই করা যাবে, তাদের নিয়ন্ত্রণ করা যাবে, দুর্বল করা যাবে, সে বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনাও উক্ত পরম্পরা যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে করেনি। রাজনৈতিক, আইনগত ও সাংস্কৃতিক উপাদানগুলি মিলিয়ে, গ্রামশির ভাষায়, যে 'স্ফিয়ার অফ কমপ্লেক্স সুপারস্ট্রাকচার' নির্মিত হয়ে ওঠে, তাও উক্ত পরম্পরা স্পষ্ট কোরে তুলতে পারেনি। তাই তার নিজস্ব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণকে এগিয়ে নিয়ে যাবার ক্ষেত্রে গ্রামশিকে প্রথমেই ঐতিহাসিক বস্তুবাদের যান্ত্রিক প্রকরণ, বিশেষ কোরে অর্থনীতিবাদের বিরুদ্ধে সমালোচনার পথে হাঁটতে হয়েছিল। ২১-২২ সেপ্টেম্বর, ১৮৯০, এঙ্গেলস জোসেফ ব্লক-কে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন :

'According to the materialist conception of history, the ultimately determining factor in history is the production and reproduction of real life. Neither Marx nor I have ever asserted more than this. Hence if somebody twists this into saying that the economic factor is the only determining one, he transforms that proposition into a meaningless, abstract, absurd phrase.'^৫ (ইটালিকস এঙ্গেলস-এর)।^৬

যারা মনে করেন শুধু অর্থনীতিই ইতিহাসের গতিকে নির্ধারণ করে তাদেরই আমরা সাধারণভাবে ‘অর্থনীতিবাদী’ হিসেবে চিহ্নিত করি (অর্থনীতিবাদ / ইকনমিজম)। এই অর্থনীতিবাদী ভাবনার সমালোচনার মাধ্যমে গ্রামশি রাজনীতির পরিসর সম্পর্কে মার্কসবাদী পরম্পরাকে বিকশিত করে তুলেছিলেন ও মতাদর্শগত আধিপত্যের ধারণাকে নির্মাণ করেছিলেন। লেনিনের পাশাপাশি মার্কস ও এঙ্গেলসের ঐতিহাসিক রচনাগুলির ওপরেও (লুই বোনাপার্টের আঠোরোই ব্রুমেয়ার, দ্যা সিভিল ওয়ার ইন ফ্রান্স, জার্মানিতে বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লব) তিনি নির্ভর করেছিলেন। মার্কসের কাছে যেমন হেগেল, গ্রামশির কাছে তেমনই ছিলেন বেনেদেত্তো ক্রোচে। ক্রোচের চিন্তাসূত্রকেও দ্বন্দ্বিক অবস্থান থেকে বিনির্মান করে গ্রামশি ব্যবহার করেছিলেন। ‘এখনো-পলিটিকাল’ পরিসরে ক্রোচের অন্তর্দৃষ্টিকে ব্যবহার করে গ্রামশি বুঝে নিতে চেয়েছিলেন : মতাদর্শ, নৈতিকতা ও সংস্কৃতিক উপাদানগুলি কীভাবে সমাজকে বেঁধে রাখে। ১৮৫৯-এ লেখা মার্কসের ‘এ কনট্রিবিউশন টু দ্যা ক্রিটিক অফ পলিটিকাল ইকনমি’-র ভূমিকাকে গ্রামশি অ্যান্টি-ইকনমিস্টিক বা অর্থনীতিবাদীদের বিরোধী অবস্থান থেকে পাঠ করেছিলেন। উক্ত বয়ানকে এইভাবে পাঠের মধ্যে দিয়ে গ্রামশি যে ব্যাখ্যা হাজির করেছিলেন তা হল : পরিবর্তনশীল সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিমন্ডলগুলি নিজেরা যান্ত্রিকভাবে রাজনৈতিক পরিবর্তনগুলিকে ‘উৎপাদন’ করেন। তারা শুধু সেইসব শর্তসমূহকে নির্মাণ করে, যে শর্তগুলি পরিবর্তনকে সম্ভব করে তোলে। পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি হল :

(১) রাজনৈতিক স্তরে ‘শক্তির সম্পর্কগুলি’ কিভাবে অবস্থান করছে,

(২) রাজনৈতিক সংগঠন কোন স্তরে অবস্থান করছে,

(৩) বিরোধী শক্তিগুলির লড়াই করার ক্ষমতা কতটা,

(৪) রাজনৈতিক জোটগুলি নিজেদের কতটা ঐক্যবদ্ধ রাখতে পারে এবং তাদের রাজনৈতিক চেতনার মান কেমন ও তারা মতাদর্শগত পরিসরে কতদূর পর্যন্ত লড়াই চালাতে পারে।^৬

পরিবর্তনশীল সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিমন্ডলগুলি যে কোনো পরিবর্তনের অবজেকটিভ বা তন্ময় শর্তসমূহ নির্মাণ করে, কিন্তু শুধু এই শর্তগুলিই স্বতঃস্ফূর্তভাবে পরিবর্তন ঘটায় না। সাবজেকটিভ বা মন্ময় ইনটারভেনশন, সাংগঠনিক প্রস্তুতি, চেতনার মান, বিরোধী ঐক্য, ইত্যাদি শর্তগুলি বাদ দিয়ে পরিবর্তন আনা সম্ভব নয়। দীর্ঘস্থায়ী, সচেতন, সংগঠিত প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে না যেতে পারলে শ্রমিক শ্রেণীর ওপর এবং তার সহযোগী শ্রেণী ও গোষ্ঠীগুলির ওপর সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শগত আধিপত্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।

মতাদর্শগত আধিপত্য

গ্রামশির কাছে লেনিন ছিলেন মতাদর্শগত আধিপত্য বিষয়ক আধুনিক ধারণার প্রধান স্তপতি। কারণ তিনিই একজন তাত্ত্বিক হিসেবে নির্দিষ্ট পরিভাষা ব্যবহার করে রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত

লড়াইতে নেতৃত্ব দিয়েছেন। এই কাজ করতে গিয়ে তিনি সাংস্কৃতিক সংগ্রামের গুরুত্ব বিষয়ে পুনর্মূল্যায়ন করেন।

১৯১৭-র রুশ বিপ্লবের অনেক আগেই ১৯০২-তে ‘হোয়াট ইজ টু বি ডান’-এ লেনিনের তত্ত্বায়নের মধ্যে গ্রামশির মতাদর্শগত আধিপত্য বিষয়ক আধুনিক ধারণার সূচনা দেখা যায়। শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ততার ধারণা বুর্জোয়া মতাদর্শের প্রভাবকে মজবুত করে। শ্রমিকশ্রেণীর স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন হল ট্রেড ইউনিয়নবাদ, আর ট্রেড ইউনিয়নবাদ হল শ্রমিকদের ওপর বুর্জোয়াদের মতাদর্শগত দাসত্ববন্ধন। সেই কারণে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনকে বুর্জোয়াদের নিয়ন্ত্রণে চলে যাবার এই স্বতঃস্ফূর্ত ট্রেড ইউনিয়নবাদী ঝোঁক থেকে মুক্ত করে, ভিন্নমুখী করে, বৈপ্লবিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণে আনাই মার্কসবাদীদের কাজ। লেনিন বুর্জোয়া সমাজে বুর্জোয়া মতাদর্শের আধিপত্যের প্রতাপ ও প্রাবল্য সম্পর্কে বলেছেন : উৎপত্তির দিক থেকে বুর্জোয়া মতাদর্শ সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের তুলনায় অনেক পুরানো ও অপেক্ষাকৃত পূর্ণাকারে বিকশিত। সেইসঙ্গে শাসক শ্রেণীর সঙ্গে সংলগ্ন হবার সূত্রে বুর্জোয়া মতাদর্শের সঙ্গে রয়েছে তাকে অপরিমেয়ভাবে প্রচার-বিস্তারের ক্ষমতা। সেই কারণে একটি দেশে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন যত বেশি নবীন সেখানে অ-সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শ গেড়ে বসার সমস্ত চেষ্টার বিরুদ্ধে এই আন্দোলনের সংগ্রাম হওয়া চাই ততই প্রবল। যারা সংগঠিত ভাবে শ্রমিক শ্রেণীর সচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়াসকে খাটো করে দেখায় তাদের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে সংগ্রাম চালাতে হবে।^৭ লক্ষ্য করার বিষয় : ‘অর্থনীতিবাদীরা’ বেস বা কাঠামোকে ‘কারণ’ ও সুপারস্ট্রাকচার বা উপরিকাঠামোকে তার ‘ফলাফল’ মনে করে বোলে শ্রমিক শ্রেণীর সচেতনতা বৃদ্ধির সংগঠিত প্রয়াসকে গুরুত্বহীন মনে করে। মার্কসবাদীদের দায়িত্ব হল শ্রমিক শ্রেণীর চেতনায় সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শগত আধিপত্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ট্রেড ইউনিয়নবাদের চেতনা থেকে, অর্থনীতিবাদের চেতনা থেকে, সমাজতন্ত্রের চেতনায় উদ্ভীর্ণ করা। ১৯১১-তে লেনিন প্যারিস কমিউনের পরাজয়ের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে লিখেছেন :

‘For the victory of the social revolution, at least two conditions are necessary: a high development of productive forces and the preparedness of the proletariat. But in 1871 neither of these conditions was present. French capitalism was still only slightly developed, and France was at that time mainly a country of petty-bourgeoisie (artisans, peasants, shopkeepers, etc.). On the other hand there was no workers’ party, the working class, which in the mass was unprepared and untrained, did not even clearly visualize its tasks and the methods of fulfilling them. There were no serious political organizations of the proletariat, no strong trade unions and co-operative societies.’^৮

এখন সবাই এই বিষয়ে একমত যে, গ্রামশির জেল ডায়েরিতে মূল কনসেপ্ট বা ধারণা হচ্ছে হেজিমনি বা মতাদর্শগত আধিপত্যের



ধারণা এবং এই ধারণাই মার্কসবাদী তত্ত্বচিন্তার জগতে তার প্রধান ও মৌলিক অবদান। কারাবাসের অব্যবহিত আগেই তিনি ‘দ্যা সাদার্ন কোয়েশেন’ প্রবন্ধে শ্রমিক-কৃষক ঐক্য ও সহযোগী শ্রেণীগুলির ওপর শ্রমিক শ্রেণীর হেজিমনি বা মতাদর্শগত আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গ এনেছিলেন। এই মতাদর্শগত আধিপত্যই বুর্জোয়া শ্রেণীকে ক্ষমতা থেকে অপসারণের ও শ্রমিক শ্রেণীর শাসনের সামাজিক ভিত্তি নির্মাণ করে। জেল ডায়েরিতে তিনি দেখিয়েছেন : ফরাসী বিপ্লবের সময়ে যে ব্যাপ্ত সামাজিক ঐক্যমতের ওপর নতুন ফরাসী রাষ্ট্র নির্মিত হয়েছিল, তার তুলনায় ইতালির রিসোরজিমেন্টোর যুগে ঐক্যবদ্ধ ইতালিতে রাষ্ট্র অনেক দুর্বল সামাজিক ঐক্যমতের ওপর দাঁড়িয়েছিল। তিনি ম্যাকিয়াভিলি (Niccolò di Bernardo dei Machiavelli, 3 May 1469 – 21 June 1527) ও পেরিতো-র (Wilfried Fritz Pareto, 15 July 1848 – 19 August 1923) তত্ত্বচিন্তার বিনির্মানের মধ্যে দিয়ে দেখিয়েছেন, বুর্জোয়া আধিপত্য প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন ধরনের বহিঃপ্রকাশ রয়েছে। তিনি রাষ্ট্রকে একই সঙ্গে সম্মতি ও বলপ্রয়োগের সংশ্লেষ হিসেবে দেখতেন। আধুনিক বিশ্বে কোনও শাসকই শুধু বলপ্রয়োগমূলক সংগঠনের ওপর নির্ভর কোরে শাসন চালাতে পারেনা, আধিপত্য বজায় রাখতে পারেনা। তাকে তার সংকীর্ণ, করপোরেটিভ স্বার্থকে অতিক্রম কোরে যেতে হয় এবং তার সহযোগী শ্রেণীগুলির ওপর নৈতিক ও বৌদ্ধিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হয়। সেইসঙ্গে ঐক্যবদ্ধ সামাজিক ব্লকের বিভিন্ন

সহযোগী শ্রেণীগুলির সঙ্গে কিছুদূর পর্যন্ত বোঝাপড়াও গড়ে তুলতে হয়। এই সামাজিক ব্লকটিকেই গ্রামশি বলেছিলেন ‘হিস্টোরিক ব্লক’।

হিস্টোরিক ব্লক

হিস্টোরিক ব্লক বলতে গ্রামশি বুঝিয়েছেন, বেস বা কাঠামো ও সুপারস্ট্রাকচার বা উপরিকাঠামোর, তত্ত্ব ও কর্মের, বুদ্ধিজীবী ও জনগনের দ্বন্দ্বিক ঐক্য। হিস্টোরিক ব্লক শুধু সামাজিক শক্তিশক্তির জোট নয়। এই ধারণা একদিকে যেমন ‘ইকনমিজম’ বা অর্থনীতিবাদের থেকে মার্কসবাদকে পৃথক করে, অন্যদিকে তেমনি নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে বিভিন্ন ধরনের রেসিথ্রোসিটি বা পারস্পরিকতা বা অন্যান্যতা বিষয়ক পাঠ-পর্যবেক্ষণকে নিশ্চিত করে।

‘Structure and superstructure form a ‘historic block’. That is to say the complex, contradictory and discordant ensemble of the superstructures is the reflection of the ensemble of the social relations of production.’^১

এই হিস্টোরিক ব্লক একটি নির্দিষ্ট সামাজিক ব্যবস্থার স্বপক্ষে সম্মতির প্রতিনিধিত্ব করে। এই হিস্টোরিক ব্লকের মধ্যেই শাসক শ্রেণীর মতাদর্শগত আধিপত্য ক্রমাগত সৃষ্টি ও পুনঃসৃষ্টি হতে থাকে -- বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সামাজিক সম্পর্কসমূহ ও বহুবিধ ধারণাসমূহের জালের বিস্তারের মধ্যে দিয়ে। এই জালের সুতোগুলিকে বয়ন-

বুননের দায়িত্ব পালন করেন বুদ্ধিজীবীরা। এইভাবে বুদ্ধিজীবীরাও একটি নিদৃষ্ট সামাজিক ব্যবস্থায় সংগঠকের দায়িত্ব পালন করেন। বুদ্ধিজীবীরা শাসক শ্রেণীর স্বপক্ষে মতাদর্শগত আধিপত্য বানিয়ে তোলার মাধ্যমে, সামাজিক ঐক্যমত ও সম্মতি বানিয়ে তোলার মাধ্যমে, শাসক শ্রেণীর দ্বারা নিপীড়িত মানুষদেরও শাসক শ্রেণীর শাসনবৃত্তে ও চিন্তাবৃত্তে আন্তীকৃত করে ফেলেন। গ্রামশির মতাদর্শগত আধিপত্য বিষয়ক ধারণা এইভাবে মার্কসীয় রাষ্ট্রতত্ত্বকে বিকশিত করে তুলেছিল।

সিভিল সোসাইটি ও পলিটিকাল সোসাইটি

গ্রামশি সিভিল সোসাইটি বা জনসমাজ পলিটিকাল সোসাইটি বা রাজনৈতিক সমাজ বলতে বোঝাতেন :

‘The relationship between the intellectuals and the world of production is not as direct as it is with the fundamental social groups but is, varying degree, ‘mediated’ by the complex of superstructures, of which the intellectuals are, precisely, the ‘functionaries’ . It should possible both to measure the degree of ‘organicism’ of the various intellectual stratas and their degree of connection with a fundamental social group, and to establish a gradation of their functions and of the superstructures from the bottom to the top (from structural base upwards). What we can do, for a moment, is to fix two major superstructural ‘levels’: the one that can be called ‘civil society’, and that of ‘political society’ or the state’. These two levels corresponds on the one hand to the function of ‘hegemony’ with the dominant group exercises throughout society and on the other hand to that of ‘direct domination’ or command exercised through the state and ‘juridical’ government. The function in question are precisely organizational and connective.”^{১০}

যেসব সামাজিক সক্রিয়তা ও প্রাতিষ্ঠানগুলি সরকারের, বিচারব্যবস্থার ও দমনমূলক সংস্থাগুলির (পুলিশ, সশস্ত্র বাহিনী) অংশ নয় তাদের সক্রিয়তার যোগফল হল সিভিল সোসাইটি বা জনসমাজ। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি, ট্রেড ইউনিয়নগুলি, রাজনৈতিক দলগুলি, যারাই সমাজে কোনো না কোনো ভাবে, কোন না কোনো শ্রেণীর স্বপক্ষে মতাদর্শগত আধিপত্য নির্মাণ করে, তারা সবাই সিভিল সোসাইটি বা জনসমাজের অংশ। জনসমাজ হল সমাজের সেই পরিসর, যেখান থেকে কতৃৎকারী (ডমিন্যান্ট) সামাজিক গোষ্ঠীগুলি সম্মতি ও মতাদর্শগত আধিপত্য নির্মাণ করে। অন্যদিকে, রাজনৈতিক সমাজ হল সমাজের সেই পরিসর, যেখান থেকে কতৃৎকারী (ডমিন্যান্ট) সামাজিক গোষ্ঠীগুলি সরাসরি বলপ্রয়োগের ও প্রত্যক্ষ কতৃৎকারী মাধ্যমে শাসন করে।^{১১} জনসমাজ ও রাজনৈতিক সমাজের এই বিভাজন পুরোপুরি মেথডোলজিক্যাল, কিন্তু বাস্তব জীবনে এই

দুই পরিসরের মধ্যে ওভারল্যাপিং জোন রয়েছে।

প্যাসিভ রেভোলিউশন

সময়ের মধ্যে দিয়ে রাষ্ট্রও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে জনসমাজের মধ্যে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করে। আবার রাজনৈতিক আন্দোলন, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ও বিভিন্ন ধরনের গণআন্দোলনের মধ্যে দিয়ে যে সব দাবী উঠে আসে তার প্রতিক্রিয়া হিসেবে তথাকথিত ‘সংগঠিত ধনতন্ত্র’ মতাদর্শগত আধিপত্য প্রতিষ্ঠার কৌশল বদলে ফেলে। তার ফলে শাসক শ্রেণী উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে গুণগত পরিবর্তন না এনেও নিম্নবর্গের একটি অংশকে মতাদর্শগত আধিপত্য প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে স্বশ্রেণীর পরিধিতে আন্তীকৃত করে ফেলতে পারে। এই প্রক্রিয়াকে গ্রামশি বলেছেন ‘প্যাসিভ রেভোলিউশন’ বা নিষ্ক্রিয় বিপ্লব। তিনি এই পরিভাষাটি পেয়েছিলেন ভিনসেনজো কুকো-র (Vincenzo Cuoco (October 1, 1770 – December 14, 1823) ‘Historical Essay on the Neapolitan Revolution of 1799’ বইটি থেকে। ভিনসেনজো কুকো-কে ইতালির লিবারেলিজম-এর প্রতিষ্ঠাতা বোলে বিবেচনা করা হয়। এডমুন্ড ব্রুক, জোসেপ ডি মেইসট্রি, বেনেদেত্তো ক্রোচে ও গ্রামশির চিন্তার ওপর তার প্রভাব ছিল। কিন্তু গ্রামশি ‘প্যাসিভ রেভোলিউশন’ বা নিষ্ক্রিয় বিপ্লব পরিভাষাটির অর্থ সম্পূর্ণ বদলে ফেলে নিজের মতো করে ব্যবহার করেছিলেন। নিষ্ক্রিয় বিপ্লব পরিভাষাটি গ্রামশি ব্যবহার করেছিলেন এমন এক ঐতিহাসিক অবস্থা সম্পর্কে, যখন সামাজিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কসমূহের মধ্যে গুণগত পরিবর্তন না এনেই নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থা ক্ষমতায় চলে আসে। গ্রামশির কাছে নিষ্ক্রিয় বিপ্লবের প্রথম উদাহরণ ছিল রিসোরজিমেন্টোর যুগের ঘটনাবলী। বুর্জোয়ারা কভুর-এর নেতৃত্বে (Cavour, 10 August 1810 – 6 June 1861) (মডারেটরা) রিসোরজিমেন্টোর যুগে ক্ষমতা দখল করেছিল ফ্রান্সের মতো কোনও বিপ্লব না ঘটিয়েই। গ্রামশি এই অভিজ্ঞতাকে ব্যবহার করে রেস্টোরেশনের ১৮১৫-র পরবর্তী অন্যান্য লিবারেল আন্দোলনগুলিকে ব্যাখ্যা করেছিলেন ও তার বিস্তার ঘটিয়েছিলেন ফ্যাসিবাদের উত্থান পর্যন্ত। ফ্যাসিবাদ অর্থনীতির আধুনিকীকরণ ঘটিয়েছিল ‘ওপর থেকে’ এবং লাইসেজেফার বুর্জোয়ারদের (laissez-faire policy / অবাধ উদ্যোগের নীতি) ও সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনের রাজনৈতিক ক্ষমতাকে একইসঙ্গে ধ্বংস করে। গ্রামশি এই প্রকরণের ‘প্যাসিভ রেভোলিউশন’ বা নিষ্ক্রিয় বিপ্লবকে কতৃৎকারী শ্রেণীর ওয়ার অফ পোজিসন বা অবস্থায়ী সংগ্রামের এক ধরনের বহিঃপ্রকাশ বোলে মনে করতেন।^{১২}

অবস্থায়ী সংগ্রাম ও চলিষ্ণু সংগ্রাম

১৯১৮-তে লেনিন ‘বামপন্থী কমিউনিজম ও শিশুসুলভ বিশৃঙ্খলা’ বইতে দেখিয়েছেন : রুশ বিপ্লবের কয়েকটি মূল বৈশিষ্ট্য ছাড়া অন্য ক্ষেত্রেও তাকে প্রয়োগ করতে যাওয়াটা মস্ত বড় ভুল। এ কথাটাও

মনে না রাখা ভুল হবে যে, অত্যন্ত একটা অগ্রসর দেশে শ্রমিক বিপ্লব সাফল্যমন্ডিত হলে ঘটনাবলী সম্ভবত সম্পূর্ণ নতুন খাতে বইবে। অর্থাৎ এর ঠিক পরেই রাশিয়া আর একটা দৃষ্টান্ত স্থানীয় (মডেল) দেশ থাকবে না, আবার তা পিছিয়ে পড়া দেশ হিসেবে গণ্য হবে। সমাজতান্ত্রিক সমাজ শ্রেণীহীন সমাজ নয়। বিপ্লবের পরেও সমাজতান্ত্রিক দেশে শ্রেণী সংগ্রাম থেকে যায়। সেইসঙ্গে ক্ষমতাচ্যুত বুর্জোয়াদের প্রতিরোধ ক্ষমতা দশগুণ বেড়ে যায়। এই ক্ষমতার উৎস শুধু আন্তর্জাতিক পুঁজির শক্তি আর বুর্জোয়া শ্রেণীর বিশ্বব্যাপী সম্পর্কের জোর ও স্থায়িত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। পাশাপাশি প্রথাগত অভ্যাসের প্রভাব ও ছোটো আকারের উৎপাদন ব্যবস্থার শক্তির মধ্যেও তার শিকড় প্রোথিত রয়েছে। এই ছোটো আকারের উৎপাদন ব্যবস্থা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে রয়েছে। এই উৎপাদন ব্যবস্থা প্রতিঘন্টায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে ও ব্যাপকভাবে পুঁজিবাদ ও বুর্জোয়া শ্রেণীর জন্ম দিচ্ছে। উক্ত বইতে ১৯১৮-তে লেনিন খুব স্পষ্টভাবেই বলেছেন : বিপ্লবের পরেও শ্রেণীবিভাগ এখনও রয়েছে ও শ্রমিকশ্রেণী ক্ষমতা দখল করার পরেও বহু বছর শ্রেণীর অস্তিত্ব থাকবে। ইংল্যান্ডে, যেখানে কৃষক সম্প্রদায় নেই (কিন্তু ছোট মালিক আছে) সম্ভবত এই সময়টা সেখানে অপেক্ষাকৃত কম লাগবে। শ্রেণীসমূহের বিলোপ সাধনের অর্থ শুধুমাত্র জমিদার ও পুঁজিপতিদের উৎখাত করা নয় – সে কাজটা আমরা (বিপ্লবের পরে বলশেভিকরা) অপেক্ষাকৃত সহজেই কোরে ফেলেছি। শ্রেণীসমূহের বিলোপ সাধনের অর্থ ছোট উৎপাদকদেরও বিলোপ সাধন। আর এদের বিতাড়িত করা বা ধ্বংস করা সম্ভব নয়। বিপ্লবের পরেও তাদের সঙ্গে সামঞ্জস্য কোরে থাকতে হবে। দীর্ঘস্থায়ী, ধীর, সতর্ক সাংগঠনিক কাজের মধ্যে দিয়ে তাদের নতুন কোরে গড়া যায় ও তা করতেই হবে। তাদের নতুন ভাবে শিক্ষিত করা সম্ভব। এই ছোট উৎপাদকরা শ্রমিকশ্রেণীকে চারদিক থেকে পেটি-বুর্জোয়া আবহাওয়ায় ঘিরে রাখে। এই আবহাওয়া শ্রমিক শ্রেণীকে জর্জরিত করে, আদর্শভ্রষ্ট করে, শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে পেটি-বুর্জোয়াসুলভ মেরুদণ্ডহীনতা, অনৈক্য, আত্মকেন্দ্রিকতা, ক্ষণে ক্ষণে উল্লাস বিষাদের ওঠাপড়ার মেজাজ অনবরত জাগিয়ে তোলে। লক্ষ লক্ষ ছোটোখাটো মালিকদের ‘পরাজিত’ করার থেকে জমজমাট বড় বুর্জোয়া শ্রেণীকে পরাজিত করা হাজার গুণ সহজ। কারণ ছোটো মালিকরা প্রতিদিন, সাধারণ কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে সবার অলক্ষ্যে, ধরাছোঁয়া এড়িয়ে, হতাশা ছড়িয়ে, ঠিক এমন একটা অবস্থা সৃষ্টি করে, যা বুর্জোয়াদের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও যার পরিণতিতে বুর্জোয়াদের পুনরুজ্জীবনের অবস্থা সৃষ্টি হয়। সেই কারণের লেনিন সতর্ক কোরে দিয়ে বলেছিলেন: শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রণী অংশের দায়িত্ব হল, শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষক সম্প্রদায়ের সবচেয়ে পিছিয়ে পরে অংশকে গড়েপিটে শিক্ষিত কোরে তোলা, তাদের আলো দেখানো, নতুন জীবনের ভাগীদার কোরে তোলা। শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে কোন অবস্থায় ও কখন ক্ষমতা দখল করা যায়, কীভাবে দখল করা যায়, ক্ষমতা দখলের সময়ে ও তার পরে শ্রমিকশ্রেণীর ব্যাপকতম অংশ ও অ-শ্রমিক মেহনতী মানুষের উপযুক্ত সমর্থন আদায় করা

যায়, কীভাবে মেহনতী জনতার আরও ব্যাপক অংশকে গড়েপিটে শিক্ষিত কোরে টেনে এনে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব বজায় রাখা যায় এবং তাকে আরও ব্যাপ্ত, গভীর, সংহত কোরে তোলা যায় -- তাকে বাস্তবায়িত করাই হল রাজনীতির আর্ট। কর্মকৌশলের ভিত্তি করতে হবে নির্দিষ্ট রাষ্ট্রের সমস্ত শ্রেণীশক্তির ধীরস্থির ও নিখুঁত বস্তুনিষ্ঠ পর্যালোচনার ওপর, আর সেই সঙ্গে বিপ্লবী আন্দোলনের অভিজ্ঞতার ওপর। রাশিয়ার চেয়ে ইয়োরোপে কোনো পর্যালোচনা সত্যিকারের বিপ্লবী সংস্থা গঠন করা অনেক বেশি কঠিন। ১৯১৭ সালের বিশেষ ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে সব দিক থেকে স্বতন্ত্র এক অবস্থায় রাশিয়ার পক্ষে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব শুরু করা সহজ হয়েছিল, কিন্তু ইয়োরোপের দেশগুলির চেয়ে রাশিয়ার পক্ষে বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, সম্পূর্ণ করা, অনেকবেশি কষ্টসাধ্য এবং অন্যদিকে রাশিয়ার চেয়ে পশ্চিম ইয়োরোপে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব শুরু করাও অনেক কঠিন।^{১০}

গ্রামশিও লেনিনের নেতৃত্বাবনার ভিত্তিতে, জনসমাজ ও রাজনৈতিক সমাজের সম্পর্কের বিভিন্নতার কথা বিবেচনার মধ্যে রেখে, উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশ ও অনুন্নত দেশগুলিতে বিপ্লবের কৌশলের পার্থক্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। সামরিক বাহিনীর পরিভাষা ব্যবহার কোরে গ্রামশি বলেছিলেন, অর্থনৈতিক সংকট বিপ্লবের একটি শর্ত নির্মাণ করে অবশ্যই, কিন্তু উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে ‘ফ্রন্টাল অ্যাট্যাক’-এ যাবার আগে ‘ট্রুপ’-এর মধ্যে যথাযথ প্রস্তুতি দরকার। অর্থাৎ জনগণের মধ্যে কালেকটিভ উইল বা যৌথ আকাঙ্ক্ষা প্রস্তুত কোরে তোলা দরকার। ১৯১৭-তে রাশিয়ায় রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ‘ফ্রন্টাল অ্যাট্যাক’-এ সাফল্যের কারণ : ‘the state was everything, civil society was primordial and gelatinous’। কিন্তু পাশ্চাত্যে রাষ্ট্র হচ্ছে ‘only an outer ditch’ এবং তার পিছনে রয়েছে একটি অত্যন্ত শক্তিশালী সিভিল সোসাইটি বা জনসমাজ। তাই পাশ্চাত্যে ‘ওয়ার অফ মুভমেন্ট’ বা বা চলিষ্ণু সংগ্রামের পর্ব থেকে উত্তীর্ণ হতে হয় ওয়ার অফ পোজিসন বা অবস্থায়ী সংগ্রামের পর্বে।^{১১}

সামগ্রিকভাবে মতাদর্শগত আধিপত্য প্রতিষ্ঠার ভিত্তি হল সংস্কার ও বোঝাপড়ার মধ্যে দিয়ে একটি শ্রেণীর নেতৃত্বকে বাঁচিয়ে রাখা, বজায় রাখা। সেইসঙ্গে অন্যান্য শ্রেণীগুলির চাহিদা পূরণ কোরে তাদেরও নেতৃত্বদানকারী শ্রেণীর পরিধির মধ্যে আত্মীকৃত কোরে ফেলাও মতাদর্শগত আধিপত্য প্রতিষ্ঠার ভিত্তি। গ্রামশির মতে, নেতৃত্বদানকারী বা মতাদর্শগত আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম শ্রেণী অবশ্যই একটি রাজনৈতিক শ্রেণী। কারণ সেই শ্রেণী নিজের তাৎক্ষণিক স্বার্থকে অতিক্রম কোরে গিয়ে সমাজের সামগ্রিক বিকাশে নেতৃত্বদানকারী শ্রেণী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পারে। গ্রামশির এই অবস্থান ‘অর্থনীতিবাদী’ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। শাসক শ্রেণী রাষ্ট্রকে ব্যবহার কোরে সবসময়ে তার তাৎক্ষণিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থকে চরিতার্থ করে, এমন ধারণা থেকে -- শাসক শ্রেণী কীভাবে সামাজিক নেতৃত্বদান করে, রাজনৈতিক শক্তিগুলির

মধ্যে কীভাবে ভারসাম্য বজায় রাখে এবং সবধরণের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে কীভাবে নিখুঁতভাবে ব্যাখ্যা করা যায় -- সে বিষয়ে যথাযথ বোঝাপড়া গোড়ে তোলা যায়না। তার ফলে ‘অর্থনীতিবাদ’ শ্রমিক শ্রেণীর সামনে যথার্থ রণনীতি ও রণকৌশল হাজির করতে পারেনা।^{১৫}

একজন মৌলিক মার্কসবাদী চিন্তাবিদ হিসেবে গ্রামশি জেল ডায়েরিতে ‘মার্কসিস্ট সায়েন্স অফ পলিটিক্স’-কে বিকাশের চেষ্টা করেছিলেন। পূর্ণ বিকশিত হেজিমনি বা মতাদর্শগত আধিপত্য দাঁড়িয়ে থাকে অ্যাকাটিভ কনসেন্ট বা সক্রিয় সম্মতির ওপর, কালেকটিভ উইল বা যৌথ আকাঙ্ক্ষার ওপর – যার ফলে সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠী একব্যবধ থাকে। সাধারণভাবে গৃহিত একটি ধারণা হল : পূর্ণ গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয় বিমূর্ত নাগরিক অধিকারসমূহের প্রতি রাজনৈতিক দায়বদ্ধতার মধ্যে দিয়ে। গ্রামশি এই ধারণাকে অতিক্রম করে গিয়েছিলেন। তার মতে, হেজিমনি বা মতাদর্শগত আধিপত্যের সর্বোচ্চ প্রকরণের মধ্যে দিয়েই পূর্ণ গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইতালির রিসোরজিমেন্টোর যুগের ঘটনাবলীকে বিশ্লেষণ করে গ্রামশি দেখিয়েছেন, দুর্বল প্রকৃতির সম্মতি একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তিকে দুর্বল করে দেয় ও যা ঐ ব্যবস্থাকে ক্রমাগত বলপ্রয়োগের ওপর নির্ভরশীল করে তোলে। হেজিমনি বা মতাদর্শগত আধিপত্যকে লেজিটিমাইজেশন বা বৈধতা, ফলস কনসাসনেস বা ভ্রান্ত চেতনা ও জনগনের চেতনার মধ্যে কারচুপির স্তরে নামিয়ে আনা যায়না। কারণ সাধারণ নাগরিকদের ‘কমন সেন্স’-এর মধ্যে এমন অনেক উপাদান বিদ্যমান যারা অন্তর্দ্বন্দ্ব আকীর্ণ। এইসব উপাদানগুলির মধ্যে যেগুলি প্রতিদিনের যাপিত জীবনের মধ্যে থেকে উৎসারিত হয় সেগুলি প্রায়শই কতৃৎকারী শ্রেণীর মতাদর্শের সঙ্গে দ্বন্দ্ব লিপ্ত থাকে। এই ‘কমন সেন্স’-এর বিপরীতে কতৃৎকারী মতাদর্শগত আধিপত্য অনেক বেশি আসঞ্জিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ এক বীক্ষা হাজির করে, যা সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির সাংগঠনিক নীতিকে নির্মাণ করে তুলতে ও জনগনকে নিয়ন্ত্রণ করতে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গ্রামশির মতে, মতাদর্শ সহজসরলভাবে আয়নার মতো অর্থনৈতিক শ্রেণী স্বার্থের প্রতিফলন ঘটায় না। এই দিক থেকে দেখলে, মতাদর্শ, অর্থনৈতিক কাঠামো বা সমাজ-সংগঠন দ্বারা নির্মিত, ‘গিভন’ বা যথাপ্রাপ্ত কোনো বিষয় নয়। পক্ষান্তরে মতাদর্শ এক ধরনের সংগ্রামের পরিসর। সামাজিক-সম্পর্কসমূহের-প্রতিষ্ঠানসমূহের-সক্রিয়তাসমূহের মধ্যে দিয়ে মতাদর্শ তার কর্মকাণ্ডকে সংগঠিত করে তোলে এবং সব ধরনের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সক্রিয়তাকে নির্ধারণ করতে থাকে।^{১৬}

গ্রামশি সর্বহারা শ্রেণীর জন্য বিশেষ যে প্রকল্পের কথা বলেছিলেন তা হল : এমন এক ‘রেগুলেটেড সোসাইটি’ নির্মাণ করতে হবে,

যেখানে মতাদর্শগত আধিপত্য, জনসমাজ ও সামাজিক সম্মতির পরিসর এমনভাবে বিকশিত হবে যে, রাজনৈতিক সমাজ ও বলপ্রয়োগের ভূমিকা ক্রমাগত কমে আসবে। অর্থাৎ সর্বহারা শ্রেণী ধারাবাহিকভাবে কনসেন্ট বা সম্মতির ভূমিকাকে ব্যাপ্ত কোরে তুলবে। যার পরিণতিতে বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর স্বার্থসমূহ আসঞ্জিত হয়ে উঠবে ও একটি নতুন হিস্টোরিক ব্লক নির্মিত হয়ে উঠবে। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে যে স্ট্র্যাটেজি বিকশিত কোরে তোলা দরকার তা জনপ্রিয় ধারণা ও সক্রিয়তাগুলিকে নির্দিষ্ট প্রণালীতে সাজিয়ে তুলবে। গ্রামশির লোকসংস্কৃতি ও জনপ্রিয় সংস্কৃতি সম্পর্কে সমালোচনামূলক ব্যাখ্যা, ধর্ম সম্পর্কে ব্যাখ্যা, দার্শনিকদের প্রথাগত দর্শন আলোচনার পারম্পরিক সম্পর্কের ব্যাখ্যা ও সাধারণ নাগরিকদের প্রথামুক্ত দর্শন বা বিশ্বদৃষ্টির ব্যাখ্যা – সবটাই দাঁড়িয়ে আছে তার মতাদর্শগত আধিপত্য বিষয়ক ধারণার ওপর।^{১৭}

টিকা ও সূত্রনির্দেশ

- ১। Giuseppe Fiori, Antonio Gramsci : Life of a Revolutionary, Verso, 1990, p. – 217-218।
- ২। Antonio Gramsci, The Modern Prince and Other Writings, International Publishers, New York, 1980, p. – 55।
- ৩। Antonio Gramsci, Selections from the Prison Notebooks, Edited and Translated by Quintin Hoare and Geoffrey Nowell Smith, Orient Blackswan, 2009, p. – xciv।
- ৪। Antonio Gramsci, The Modern Prince and Other Writings, Ibid, p. – 56।
- ৫। Marx and Engels, On Art and Literature, Progress Publishers, Moscow, 1978, p. – 57।
- ৬। An Antonio Gramsci Reader, Ed. By David Forgacs, Schocken Books, NY, 1988, pp. – 189-190।
- ৭। লেনিন, নির্বাচিত রচনাবলী (বারো খন্ডে), প্রথম খন্ড, এনবিএ, ২০১০, পৃষ্ঠা - ১২৬ - ১২৮।
- ৮। Lenin on Paris Commune, [https:// www.marxists.org/ history/ etol/ newspaper/ themilitant/ 1932/ no12 /lenin.htm#top](https://www.marxists.org/history/etol/newspaper/themilitant/1932/no12/lenin.htm#top)।
- ৯। An Antonio Gramsci Reader, Ibid, p. – 192।
- ১০। An Antonio Gramsci Reader, Ibid, p. – 306।
- ১১। An Antonio Gramsci Reader, Ibid, p. – 420।
- ১২। An Antonio Gramsci Reader, Ibid, p. – 428।
- ১৩। লেনিন, বামপন্থী কমিউনিজম ও শিশুসুলভ বিশৃঙ্খলা, এনবিএ, ১৯৮০, পৃষ্ঠা - ১, ৪, ২৬, ৩৩, ৩৪, ৪৭, ৪৮।
- ১৪। An Antonio Gramsci Reader, Ibid, p. – 222।
- ১৫। A Dictionary of Marxist Thought, Edited by : Tom Bottomore, Maya Blackwell, New Delhi, 2000, pp. – 230 – 231।
- ১৬। Ibid, p. – 231।
- ১৭। Ibid।

গল্প

বুলিবিবির উপাখ্যান

চন্দ্র শেখর চট্টোপাধ্যায়



চালের ছায়াটা দীর্ঘ হতে হতে ঘরের চৌকাঠ স্পর্শ করল। পশ্চিমমুখো ঘর, বেলা যত পড়বে, রোদ্দুর তত ছড় ছড় করে ঘরে ঢুকবে। আহাম্মকের দল পঞ্চায়েতের এত ঘর থাকতে ঠিক পশ্চিমমুখো এই ঘরটাই বেছেচে। মধুবাবু অনেকক্ষণ ধরেই এতদ অঞ্চলের অর্থাৎ গ্রাম দিগরুই ভিকুডহর খোদাবান্দা এলাহিগঞ্জ,

আহেরিগঞ্জ, গ্রাম সমূহের লোকশিল্পীদের বায়োডাটা ও ক্যাসেট বন্দি গান জুটিনি করছিল। এবার সত্যি সত্যি ধৈর্যের বাঁধ ভাঙল, যখন দেখল এই পরন্ত দুপুরেও অপেক্ষমান সংখ্যাটি প্রায় পঞ্চাশের উপর। বিরক্তি দেখিয়ে উঠে পড়বে তারও কোনো উপায় নাই, সকাল থেকে স্বঘোষিত চারটে দিদির ভাই, কলার তোলা নীল পাঞ্জাবি পরিহিত, চেয়ারে পা তুলে

বসে গুলতানি মারছে। তারাই হত্কার্তা বিধাতা, ওরাই এই সময়ের উনপক্ষ। অবশ্য এখন সব পক্ষ উনপক্ষ। হয় উ নয় উ। উ মানে একজিষ্ট টু পক্ষ, আর যাঁরা ঝাভা হাতে পেয়েছেন, অর্থাৎ উন্নয়নের পক্ষে নাম লিখিয়ে নিশ্চিত হয়েছেন, তারাই উনপক্ষ।

ধোঁয়ার তৃষ্ণায় মধুবাবুর বুকটা খাঁ খাঁ করছে। সম্মুখে চার চারটি হুমদো, চেয়ারে পা তুলে বসে আছে। লাল জমানায় একটা হুমদো বসতো, নীল জমানায় একের জায়গায় চার। সিগ্রেট প্যাকেট বের করলেই ছোঁ মেরে তুলে নেবে। শ্লা মাজি গন্ডার বাজারে ডি এ দেবার নাম নাই, চার চারটি হুমদোকে বসিয়ে দিয়েছে, লোকশিল্পীদের ভাতার তালিকায় ওরাই নাকি নাম তুলবে। ওরা হাঁ বললে হাঁ ওরা না বললে না। মধুবাবু ঈষৎ বিরক্তি দেখিয়ে নীল পাঞ্জাবি পরিহিত, স্ব-ঘোষিত দিদির চারটি ভাইকে বলল, গোটা গাঁ-টাই তো এনে ফেলেছেন ভাই, তা সব্বাই কি লোকশিল্পী?

কেন, সব গাঁয়ের সব্বাই লোকশিল্পী হলে, এ গাঁয়ের কি দোষ হল?

না না সে কথা আমি বলতে চাইনি। চারজনের লাল চোখের দিকে চেয়ে, মধুবাবু একটু ভয়ই পেল, মনে মনে বলল, তাদের অজ ল্যাঙ্গে কাটবি না মুড়োয় কাটবি তোদের ব্যাপার।

দিদি যা কিছু করেন সর্ব্বার জন্য করেন। এই তুমি অমুক তুমি তমুক এ সব বাদ বিচার নেই। শিল্পী তো সব্বাই, দে হাত খুলে দে।

মধুবাবু চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, শুধু ডি-এর কথায় ওনার মনে পড়ে না।

চৌকাঠ ছাড়িয়ে ছায়াটি মেঝেয় পড়ল। দীর্ঘাঙ্গী শীর্কায়। কান দুটো বেশ বড় বড়; হাতিকান। ঘাড়ের দুপাশে তামাটে চুলের শীর্ক দুটি বিনুনি, তাতে ভরা চৈত্রের লাল পলাশ ফুল গোঁজা। ছায়া দেখে যতটুকু মনে হয়, তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে। মধুবাবু বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকে মনে মনে বলল, উনিও নাকি লোকশিল্পী। কালে কালে কত হল, চামচিকেও পাখি হল। ভিড় দেখার অছিল্লাই, মধুবাবু চেয়ার

ছেড়ে উঠে, ছায়ামূর্তি প্রত্যক্ষ করবার জন্য, আড়িমুড়ি ভেঙে, দরজার কাছে উঠে এল। সবার মাথা ছাড়িয়ে অশীতিপর বৃদ্ধা, টান টান শিরদাঁড়া, দাঁড়িয়ে রয়েছে। মুখময় বার্ধক্যের, মাকড়সার জাল। এক সময় টান টান চামড়ায় পাকা বেলের মতো রং ছিল বেশ বোঝা যায়। লাল টুকটুকে ঠোঁটে হাসিটি অমলিন। বিনুনির পলাশ ফুলগুলি সত্যি সত্যি উজ্জ্বল রক্তবর্ণ।

এতো মানুষ, এতো মানুষ এলোমেলো ভাবে দাওয়ায় বসে বা দাঁড়িয়ে গল্পগাছা করছে। বিরক্তিতে মধুবাবুর ঞ্ কুঁচকে গেল। সব শিল্পী লোকশিল্পী, এমনি এমনি নয় ভরং আছে, প্রত্যেকের বাংলায় টাইপ করা বায়োডাটা ও হাতে একটি ক্যাসেট, হয় গোষ্ঠগোপাল, পূর্ণদাস বাউল, নয় প্রহ্লাদ ব্রহ্মচারীর গাওয়া গান। কোনো এক গ্রাম্য বাউল একতারা ও ডুগি তবলা সহযোগে সকলের জন্য একই গান ক্যাসেট বন্দি করে দিয়েছে। জনে জনে গাইতে বললে, শিল্পীজন ভঙ্গিমায় প্রত্যেকে উর্ধ্বনেত্র অফিসের কড়িবরগা গুণতে লাগল।

হুমদোগুলো তাড়স্বরে হইহই করে উঠল, তাং করবেন না স্যার, এরা প্রধানের ছিলেস্ত করা শিল্পী।

অএতব হে মন, এ সংগীত শ্রবণের জন্য নয়। ইহা ভাতার জন্য নির্দিষ্ট। মধুবাবু মরমে মরমে বুঝিতে পারিলেও, বিগলিত হাসিটি চওড়া করিয়া হাসিলেন। আহা এ বড় সুখের সময় হে, ভাবিতে ভাবিতে হাই তুলিতে লাগিলেন।

স্যার, এত উসখুস করছেন ক্যানো? না মানে একটা বিড়ি-টিড়ি পেলে। ঠোঁটের হাসি ঠোঁটে রেখেই, মধুবাবু মনে মনে হুমদোগুলোকে কবে গালাগালি দিল।

বাম জমানায় এই হুমদোগুলোই ছিল। তবে সংখ্যায় একটু কম ছিল। লালাজামা এখন নীল কলার তোলা পাঞ্জাবি হয়েছে। রাজা বদলায় জামা বদলায়, শুধু মুখগুলো বদলায় না। সত্তর বছর বয়েসি স্বাধীনতা, গালভরা বাংলার গণতান্ত্রিক চেতনার মূলে সর্বব্যাপী একটু একটু করে লুপ্তপন্থি বিষ ঢালছে। টোদিকে জ্বল জ্বল করছে হাসিখুশি

পাথেনিয়াম ফুল। বাম জমানায় জন্মান পাথেনিয়াম ফুল, উনপক্ষের ঘরে হু হু করে যতই বাড়ছে, প্রতিবাদহীন মানুষেরা ততই আপন ঘরে সিঁধুচ্ছে। শামুকের মতো আপন খোলের ভেতরে মুখ লুকাচ্ছে। ভেড়ার মতো ভিত্তি মানুষেরা স্বৈরাচারী শাসকের জন্ম দিচ্ছে। আনমনা মধুবাবু নিজের মনেই চমকে উঠল, এসব কি ভাবছি। মধুবাবু আপন মনের কথাকেও পড়তে পেরেছে কিনা, ঘরের উপস্থিত সকলের চোখে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে, বুঝবার চেষ্টা করল।

হুমদোগুলো ইম্পাত-কঠিন চোখে ওর দিকেই চেয়ে আছে। তবে কী কিছু আন্দাজ করেছে। মধুবাবু বোকা বোকা মুখে দেখন হাসি ফুটিয়ে বলল, না মানে বিড়িটিড়ি...।

চারজেড়া ইম্পাত কঠিন চোখ, ওকেই জরিপ করে চলেছে। ওরা ঠোঁটের কোণে তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলল, স্যার হাত চালান। এত ভাবনার কি আছে। দেনেবালা দিচ্ছে লেনেবালা নিচ্ছে। আপনি ক্যানো কাবাব মে হাড্ডি হবেন।

মধুবাবু বেশ বুঝতে পারল সামনেই বসে আছে, দিদির চার চারটে স্বঘোষিত ভাই। বুকের কথা মুখে ফুটলে, আর কি রক্ষে আছে। এইসব ভাবনা থেকে নিজেকে মুক্ত করবার জন্য, মধুবাবু হাসি হাসি মুখে, পশ্চিমের খোলা জানালার দিকে তাকাল। ছায়াটি মেঝেয় পড়ে, কয়েক কদম এগিয়ে এল। ঞ্ কুঁচকে চোখ তুলতেই, চৈত্র সূর্য চোখে পড়ল। অগ্নিগোলক সবে উঁকিঝুঁকি মারছে। মুখোমুখি হলে এই ঘরে টেকা যাবে? হুমদোগুলোকে কে বোঝায়, সূর্যের আবর্তন চক্রের বাস্তবতা।

ছেলে চারটি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওকেই দেখছে। মধুবাবু ভিত্তি কাছিমের মতো সরকারি কর্মচারীর স্বভাবসিদ্ধ ইম্পাত কঠিন মুখাবয়ব মুখে টেনে, গস্তীর মুখে ফাইল খুলল। যদিও মধুবাবু জানেন ফাইল বন্দি সত্যটি মোটেই সত্য নয়, অদৃশ্য তর্জনী নির্দেশিত। তবুও এই খেলার আড়ালে মুখ লুকালেন। মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দিল, পকেটে সিগারেট প্যাকেট



থাকতেও এই আনকালচারদের কাছে বিড়ি চাইতে হল।

সরকারি কর্মচারীদের এই ইম্পাত কঠিন মুখোশটি ওরা বেশ ভালোই চেনে। চার হুমদো টপাটপ পকেট থেকে চারটে সিগারেট প্যাকেট বের করে মধুবাবুর সম্মুখে রাখল। বিনয়ের সঙ্গে বলল, মুখ ফুটে বলবেন তো স্যার এ তো আপনারই জন্য।

মধুবাবু সিগারেট প্যাকেট চারটি পকেটে ঢুকাতে ঢুকাতে দাঁতের হাসি হেসে বলল, এ সব আবার ক্যানো ভাই। এ তো আমাদের কর্তব্য। মনে মনে বলল, মালগুলো পঞ্চায়েতের কেওকেটা মনে হচ্ছে। ফকটে রোজগার থাকলে এমন কত নবাবি দেখান যায়। মধুবাবু ওদের বাজিয়ে দেখবার জন্য বলল, আপনারা বুঝি সব পঞ্চায়েতের নির্বাচিত প্রতিনিধি?

জনৈক হুমদো কাঁধ বাঁকিয়ে গর্বের সঙ্গে বলল, আমাদেরকে কিং মেকার বলতে পারেন।

মধুবাবু বুঝেও না বোঝার ভান করে

বলল, স্যার ঠিক বুঝতে পারলাম না।

চার হুমদো হো হো শব্দে হেসে উঠল। স্যারের কি পঞ্চায়েত ভোটে ডিউটি পড়েনি। ভোট আর হল কে, সবই তো অপ্রতিদ্বন্দ্বী। মধুবাবু মনে মনে বলল, রাজা দীর্ঘজীবী হউন। জমিদারতন্ত্র অক্ষয় হোক। মা অন্তর্পূর্ণার ভাঁড়ারে যেন না টান পড়ে।

নিচের তলায় রশদ যোগায় তাই উপর তলায় এতো বাবু বিলাস। পঞ্চায়েতে মধু আছে, কে আর চাক হাতছাড়া করতে চায় বলুন।

ধন্য ধন্য তোডডমল! মোঘল সাম্রাজ্যের স্থায়িত্বের মূলে যে তুমি, তোমা সৃষ্ট ভূমিজ কর ও জায়গিরদার। সেই ভারতবর্ষ আজও চলিতেছে। শুধু লেঠেল বদলেছে মাত্র।

দুই

চৈত্রের সূর্য সত্যি সত্যি মধুবাবুর টেবিলে থাবা গোড়ে বসল। টেবিলের সম্মুখে মানুষের ঢল নেমেছে। বেলা পড়তেই সকলের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙল। হইহই ধাক্কাধাক্কি সে যেন এক

দক্ষযজ্ঞ কাণ্ড। চার হুমদো নির্বিকার।

মধুবাবুর মনে হল, এরা এই বিশৃঙ্খলা বেশ উপভোগ করছে। অসহায় মধুবাবু বলল, স্যার এদের একটু থামান। এইভাবে কি কাজ করা যায়।

এই হুল্ল কিসের। সবার নাম উঠবে। ধৈর্য ধর। নইলে গো বেড়ন দিয়ে বের করে দেব।

চাপা গজগজ শব্দ কান পাতলেই শোনা যেতে লাগল। তবু মন্দের ভালো লাইনে শৃঙ্খলা ফিরল। মধুবাবু ফাইল খুললেন। আর তখন পড়ন্ত বিকেলে পঞ্চায়েত অফিসের টেবিলে একটি দ আকৃতি মানুষের ছায়া পড়ল। মধুবাবু ইতিমধ্যে প্রায় একশত লোক গায়কের জন্ম পত্রিকা ও তাদের ক্যাসেট বন্দি গান যথাযথ ফাইল নম্বর দিয়ে ব্যাগ বন্দি করতে লাগল। এ যেমন ধুরে রেড়ির তেল পড়েছে। বেসুরো ক্যাচকেঁচে আওয়াজ আর নেই।

অতিথি সংকারে সদা তৎপর ছেলে চারটি বৈকালিক জলখাবার টেবিলে সজাতে

লাগল। পাঁচ সানকি মুড়ি, সঙ্গে প্রত্যেক সানকিতে গোটা চারেক তেল জবজবে চপ, কাঁচা লঙ্কা, খান কতক খোসা ছাড়ান গোটা পেঁয়াজ। অন্য রেকাবিতে গণ্ডা দুয়েক দানাদার এবং ছাল ছাড়ান আস্ত দুটি শশা। দেখেই মধুবাবুর গা গুলিয়ে উঠল। ছন্ন রাগে হাঁ হাঁ করে উঠল, আরে আমি সুগারের পেসেন্ট, চপ, দানাদার নেহি চলগা, মুড়ি শশাটি তাও চলতে পারে। মুড়ি খেতে খেতে মধুবাবু বললেন, গঙ্গা, পদ্মা ভাগিরথীর এই বাগড়ি অঞ্চলে; দরিয়াগঞ্জ, আহেরিগঞ্জ, এলাহিগঞ্জ এইসব অঞ্চলে, এক সময় গস্তীরা, পঞ্চরস, আলকাপ, বোলান; গ্রামীণ রিপেটোরি বা গ্রাম সমাজের সমাজ চিত্র গানে নাটকে তুলে ধরত। সেইসব শিল্পীরা কোথায়? মধুবাবু বড় করে হাই তুলে নীল পাঞ্জাবি পরিহিত দাদাদের উদ্দেশে বলল, আলকাপ পঞ্চরস, কবি গানের শিল্পীদের তো নাম পেলাম না। ওরা সব মরে হেজে গ্যাছে নাকি?

তা বুলতে পারেন, প্যাট বড় বালায়। ওরা দায়সাড়া গোছের উত্তর দিল।

না মানে বইয়ে পড়েছি তো, কবি গানের লড়াই; একদল কংগ্রেস তো আরেক দল কমানিস্ট। সেই লড়াইয়ে কেও গুমানির সঙ্গে লড়াই চাইত না।

বনের রাজা বাঘ সি যদি বনের হরিণ খায় কম মারে বেশি, সে বনে কি হরিণ থাকে? নীল পোশাকের চারটি ভাই, মনে হল বেশ বিরক্ত, গজগজ করতে লাগল, যন্তসব উটকো, পণ্ডিত পণ্ডিত কথা।

দ আকৃতির ছায়া মানবিটি চোকাঠ ডিঙ্গে অফিস ঘরে ঢুকে পড়ল। মধুবাবু স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে চোখ না তুলে বলল, যান যান অফিস বন্ধ হয়ে গ্যাছে।

তবুও কম্পমান মানবিটি টালমাটাল পায়ে ঘরে ঢুকে পড়ল, হাঁপ ধরা গলায় বলল, বাবু আমি বুলিবিবি।

হুমদো চারটি খেঁকিয়ে উঠল, মাথা কিনে লিছো।

বাবু সেই সকাল থেকে লাইনে দাঁড়িয়ে..., কথা শেষ না করে, টেবিল দুহাতে আঁকড়ে, পতন সামলালো। অসহায় দুচোখে ঘরের মানুষদের সহানুভূতির জন্য ইতিউতি দেখতে

লাগল। যে ছেলেটি অশালিন ভঙ্গিতে, মাথা কিনে লিছো বলেছিল, অশিতীপর বুলিবিবি ঙ্গ কুঁচকে সেই ছেলেটির মুখের দিকে চেয়ে বলল, তু ফ্যালনা মিঞার ব্যাটা লোস? পেরধান মস্তীর পায়খানা দিবি বুলে টাকা লিলি, পায়খানাটো কুথা বাপ?

হুমদো চারটি খুকখুকিয়ে হেসে উঠল। বিড়ি খেতি খেতি মাঠে-ঘাটে বাহি যাওয়ার বড্ড সুখ গো নানি। বাঁধা ঘরে আঁধো বাঁধো লাগবে জি।

মধুবাবু বেশ বুঝতে পারল এটি রংতামাশার ব্যাপার নয়। এটি একটি ফ্রট কেস। এইসব লুস্পেনদের হাতেই দেশ। এরাই এখন এক একটি দেশ সেবক, দেশ গড়ার কারিগর। পশ্চিমে চলে পরা সূর্যের দিকে চোখ রেখে, চুপ করে ভাবতে লাগল, গণতন্ত্র হারালে, প্রথম হারায় সুশাসন। পেশি শক্তির শ্রীবৃদ্ধি হয়। ভারসাম্য রাখতে শাসক কে,...ডোল, ডোল, আরও ডোল বৃদ্ধি করে চলতে হয়। বৃদ্ধার ছানি-পর্য দু চোখ, যেন জ্বলে উঠল। শরীরের সর্বশক্তি দিয়ে দাঁড়িয়ে, টাকাটো দে বলে, চড় তুলে এক কদম ওদের দিকে এগিয়ে গেল।

ছেলেগুলো কৃত্রিম ভয়ে দু-কদম পিছিয়ে গেল।

বুলিবিবি যোলাটে চোখ তুলে, মধুবাবুকে পুনরায় বলল, আমি বুলিবিবি। এলাহিগঞ্জের বুলিবিবি। সেই সকাল থেকে...।

অশিতীপর বৃদ্ধার গলায় স্বর, তার প্রত্যয় মধুবাবুকে নাড়িয়ে দিল। বৃদ্ধা টেবিলে ভর দিয়ে, একটু সোজা হয়ে দাঁড়াল। তারপর অবিশ্বাসী মধুবাবুর চোখে চোখ রেখে দৃঢ় কণ্ঠে বলল, গঙ্গা, পদ্মা, ভাগিরথীর এই বাগড়ি অঞ্চলে এলাহিগঞ্জে তো একটাই বুলিবিবি আছে গো। মুসলমানি বিয়ের গীত গায়।

বুলিবিবি। বুলিবিবি। মধুবাবু স্মৃতি হাতড়াতে লাগল, ঙ্গ কুঁচকে তাকাল, বলল, আপনি বুলিবিবি; মুর্শিদাবাদ বার্তায়, পুলকেন্দুবাবুর লেখায়, আপনার কথা পড়েছিলাম। জগন্নাথন সাহেবের আমলে, আপনারদের নিয়ে তথ্যচিত্র হয়েছিল। আব্দুল জাব্বার, জিন্নার রহমানের শব্দ গান, আব্দুল-ফারহাদের জারিগান, বুলিবিবির মুসলমানি বিয়ের গীত, এতদ অঞ্চলের লোকসংস্কৃতির

গর্বা।

বুলিবিবি ফোকলা দাঁতে আকর্ণবিস্তৃত হাসল। স্মৃতির আলোয় চোখদুটি চকচক করে উঠল। ধীরে ধীরে স্মৃতি রোমন্থন করতে লাগল। হাঁ সে একদিন ছিল বটে, জুম্মার নামাজের পরে নামাজিরা ফতোয়া দিলে, বুলিবিবির মুসলমানি বিয়ের গীত লোক ছামুতে গাওয়া চলবে না। ডি এম সাহেব বুলে, দেখি কে আটকায়। সেই ভরসায় ফজলুল হক ছায়েবের বাড়িতে, সে গীতের সুটিং হয়েছিল।

মধুবাবু খাতা টেনে ক্রমিক নম্বর বসাল একশো এক। একশো মেকি শিল্পীর বায়োডাটা লিখে ক্লাস্ত মধুবাবু একশো এক নম্বরে কর্মে প্রাণ ফিরে পেল। মুঞ্চ মধুবাবু বলল, বুলিবিবি একটা গান শোনান। বুলিবিবি মাটিতে খেবড়ি কেটে বসল। তারপর মৃদু মৃদু লাঠি ঠুকে ঠুকে গাইতে শুরু করল;...

আমার বুকের মাঝে ফুটল শিমুল পলাশ ফুল/আহা লাল পতাকা আহা লাল পতাকা/ দেখ না কেমন মেখেছে রোদ্দুর।

স্বঘোষিত লোকশিল্পী নির্ণায়কেরা চিৎকার করে উঠল, থাম মাগি।

বুলিবিবি কারো কথায় তোয়াক্কা না করে, হাত নেড়ে নেড়ে গাইতে লাগল, আল্লা দ্যাখো কেমন লাল পতাকায় সেজেছে/তুমার সাধের জাহান।

মধুবাবু খুব যত্ন করে লিখল, ক্রমিক নং একশো এক। নাম;... বুলিবিবি। সাকিন; এলাহিগঞ্জ। জিলা;- মুর্শিদাবাদ।

চারজন হুমদো ক্ষিপ্রগতিতে ফাইল খানা কেড়ে নিয়ে বলল, খবরদার, এ গীত চলবে না।

বুলিবিবি হাতের লাঠিটি ছুঁড়ে ফেলে, হাত নেড়ে নেড়ে গাইতে লাগল; ... ওরো হুমদো। বুলিবিবি শিখান বুলি বুলে না বুলে না/লাল পলাশ শিমুলের গীত ছাড়া অন্য কুণু গীত জানে না জানে না।

দ আকৃতির মানবিটির ক্রমশ শিরদাঁড়া সোজা হচ্ছে।

অলঙ্করণ : চঞ্চল খান

শ্রাবণের ঘর

টোকন মান্না



দু নিভাই, দুনিভাই আছো নাকি।
দুনিভাই। ভাবি ভাবি। কিরে বাবা
আলো জ্বলছে মিটমিট, ভূতের বাড়ি
হল নাকি।

– কি হল এত চিলাও ক্যানে।

– ক্যানে। জমিদারি বাঁধ ভেঙেছে। জল হু হু
করে আসচে। ছি ছি। মানুষ জান নিয়ে জন্ম আর
তুই বউয়ের সাথে ছি ছি। আই ভাবে হাসিচ না।

গা রি রি করে। ত্রিপলটা নিয়া চল। গাঙ্গুলিদের
পাড়ায়।

– উঠতে দেবে।

মিদুল দাঁড়াল। ভাবির দিকে তাকাল। ভাবির
কিছুটা শাড়ি এলোমেলো। শরীরটা ভেজা। মস্ত
দেহটার মধ্যে রি রি ছি ছি করে। মানাদের আল
ধরে বড় বড় মাদি কলা গাছের দেহটা কাটা হচ্ছে
এক কোপে। পুকুরে মাছ গা ভেসে সাঁতরে উঠছে



লেজ দিয়ে। লেজটা তার পা। মিনু মাসি কাল সবজি খেত থেকে আদা বেগুন কলমি কেটে বোড়ে ঘরে তুলছে। জলকাদায় পেচেকেচে একাকার হয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে কুকুর বেড়াল এমনকী কালো ঘাঁড় এসে ঠাঁই নিয়েছে গাঙ্গুলিদের বস্তুতে। এখন বস্তু বটে। না হলে এমন স্বর্গের মতো জায়গাটি মিচিরমিচির করতে থাকে।

– ভাবি মিঠা কথা কইব।

– কও। জর্দার পানটা গালে নিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে হাসল। তুমি কি কইবে জানি। শরীর তো তারও খিদা আছে। মাড় আছে। যাই বল দুনি পারে না।

মিদুল তাকিয়ে থাকল চকচকে কালো মুখখানার দিকে। দেবীর মতো গঠন। গায়ের চামড়া কাদাপলি মাটির মতো। দেহটা কাঁচা কলা গাছের মতো। লম্বা দেহ। বুকটা চওড়া। মিদুল কিছু তাকিল থাকল। এমনি এমনি

চোখ টিপল।

– বউদির সাথে মোচ করছু আর আমি বাঁশকেটে ত্রিপল টাঙিয়ে এবার ঘুম পাচ্ছে।

– প্রধান এয়েচে মিদুল। মিনুভাবি শাড়ি এয়েচে।

– দেবে নাকি। ব্রাউস দেবে।

– তোর ব্রাউস নিয়ে চিন্তা পেটে দানাপানি চিন্তা করেচ।

– তার জন্য তুই আছু।

দুনিভাই তাকাল মিনুর দিকে।

– চোখ তুলে নিবু। হারামজাদা। বিয়ের সময়তো বুস্বাই থাকিস। মেনেজার কোথায় সেই বাউচুলি কথা।

– তুই কি বলিস। আমরা ডি-গ্রুপে লোক। বাঁটবাট দিই। অর মাথা ঠিক নেই আকুড়বাকুড় বকে।

– বকি লুচা। মিনু হাঁড়িটা বাঁকিয়ে রাখল। ত্রিপলের উপর। তরতর করে এগিয়ে

গেল প্রধানের দিকে।

– মিদুল সিগ্রেট ধরালো।

– এখন সিগ্রেট টানুন না।

– হেঁ হেঁ। পিকুদার দিল। কাল মেদিনীপুর থেকে এয়েচে। মালটা এইটে পড়ে শহরে গিয়ে মুসলিম মেয়ে বিয়ে বেশ কামাচ্ছে। পচা বলল।

– কাছে আয়।

– কেন?

– আয় না।

– বলল।

– পিকুদা নাকি হিন্দু থেকে মুসলিম হয়েচে। নিজের শালিকে বিয়ে করেছে।

– আস্তে। বামনজাত। নেতার ছেলে আস্তে বলল।

– জেলে গিয়েছে।

– জানি। মাগির পাচার করে।

– ছ্যা। আমরা ডি-গ্রুপ হতে পারি।

এইমন হারামি নয়।

মিনু এল। দুহাতে শাড়ি। নতুন পুরোনো।
পিঠে চালের বস্তা।

– ম্যায়েরা এনে দেবে এই বাবুরা বসে
বসে থাকে।

– তুই হলি বউ, তুই খাওয়াবি নি তো কে
খাওয়াবে। না হলে তুই আদর করে মার।

দিনুভাই আদরমেখে বলল।

– ছোট জাতের লোক কি এমনি কও।

এই কথাগুলি কি বস্তুতে বলেরে।

– বস্তু। চুপ হারামি এটা হল।

গাঙ্গুলিপাড়া।

– কে চেষ্টায়েরে।

– খগেনখুঁড়ে।

– টিনুদা বাঁধে জল বাড়ে।

– কি কও।

– হেঁরে জল। হেঁদুরে সব গুঁঝা

কলাভেলাটা নিয়া আয়।

জল ঘন্টায় ঘন্টায় বাড়ছে। দু-একটা
গাছ টুকটুক করে দেখা দিচ্ছিল দাও
জলের তোলায়। মাটির গন্ধ নেই। ঘন্টায়
ঘন্টায় খবর আসে সবং-এর সাতটা অঞ্চল
ভেসে গেছে। বাকি আছে তেমাথানি।
গরু ছাগলগুলো সব জমিদারি বাঁধে
চাই হয়েছে। খ্যাপা, তপু আর কেনারাম
সেখানে আছে। খড়ের গাদা ভেসে
লোপাট। খাবারের বড়ই সমস্যা। মাটির
ঘর থপ থপ করে ভেঙে জলের তলায়।
প্রধান নাড়ুগোপাল সিংহট কখন কখন
বিড়ির ধোঁয়া ছেড়ে টেনশান দূর করতে
থাকে।

– এরেই মধ্যে কুড়িজন মারা গেছে।
সাতজন সবং হাসপাতালে ভর্তি। বাঁচবে
না খারু।

– জি চাচা।

– বউ ঝিদের ভুঁটভুটে তুলে নেয়।

সবং বাজারে নিয়ে যেতে হবে।

– কটা ভুঁটভুট আছে চাচা।

– যটা থাকুক এখনি নিয়ে চল।

কাল সারারাত ধরে সাতটা ভুঁটভুট তুলে
নিয়ে গেছে সবং বাজারে। রামকৃষ্ণ মিশন
খাবার দিচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী উত্তরবঙ্গে আছে।

সেখানেও ভেসে গেছে। খ্যাপা, তপু আর

কেনারামরা দশ-বিশটা গরু নিয়ে হাজির।

আকুবাকু করে কাঁদতে থাকে। শয়ে শয়ে গরু
বানের জলে ভেসে গেছে। কয়েকটা লাশ
টেনে নিয়ে গেছে মুচিরা। আলি সিরারা চারটে
ভুঁটভুট গরু তুলে খাগড়াবাজারে যাচ্ছে কলাম
বক্সকে ডাকতে গেল।

– দিনুভাই এখানেই ডুবে যাবো।

– তোর ভাবি কোথায় দিনু।

– ভুঁটভুটে তুলে দিয়ে বসেছি।

– আর কি আসবে।

– কেন রে।

– তার আগে যদি জল বাড়ে।

হাঁপুস করে কেঁদে উঠে সবেতাবিবি। বয়স
আশি।

– তুই যা বাপ। ভুঁটভুট আসুক তখন
আমি যাব। মাকে কোলপাজা করে তুলে
নিয়ে গিয়েছিল। জোর ধাক্কা মারে।

– তুই মর।

বলেই বউ-বেটির সাথে উঠে পড়ে।

– চাচি গেলে না কেন।

– আমার তো সব দেখার শেষ তাই
বন্যা আমাদের মা। মায়ের বুক ভেসে
যাওয়ার পুনে।

– ওদিকে বুনুর বউ পড়ে আছে।

– কেন?

– ভাতার নাই। বেচার। পাঁচ মাসের
পুয়াতি।

– ভুঁটভুটে তুলতে পারলি না।

– না। ঠেলাঠেলিতে জলে পড়ে গেল।

– কলাভেলা আছে। মিদুল ঘুরেফিরে
এসে বলে কেউ নাই চারপাঁচটি প্রাণী।

– গাছকাট।

– দাদা বাঁচব তো।

– হেঁ। দিনুভাই বুনুর বউয়ের হাত ধরে
বলে। আমি আছি। তোকে আমি বাঁচাবো।

– তুই কি খ্যাপা হয়ে গেলি। দিনুভাই।

– হেঁ। খ্যাপা হয়ে গেছি। বড় গাছ

কেটে পাতলা শরীরটা হলেদুলে টানতে
টানতে জলে ভেলা করল।

তখন সন্ধে। জলে ডুবে গেল গাঙ্গুলিদের
বাস্ত। আর কোনো আশ্রয় নেই। দিনুভাই
বুনুর বউকে গাছভেলাতে তুলে সাঁতার
দিতে দিতে উত্তর দিকে ভেসে গেল।

– দিনুভাই দেখে যা।

– তুই তাড়াতাড়ি চলে আয়।

সকাল থেকে মেঘ মেঘ। কয়েকদিন হল
বর্ষায় গ্রামের গ্রাম ভেসে গেছে। বুনু আলি।
পার্টির দাপটে নেতা ছিল। ছয়মাস আগে
সবং থেকে রাতে ফেরার পথে গুলি করে।
এখান থেকে প্রায় সাত কিমি। তেলিভাবি
ঘুমিয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে দিনুভাইয়ের
দিকে চেয়ে হাসল।

– বাচ্চাটা নড়ছে।

দিনুভাইও হাসল। জলে কোনো রাস্তা
নেই। জলেও রাস্তা থাকে। কিন্তু পায়ের
সাথে মাটির কোনো খবন নেই। সুখদুঃখ
একেবারে কাছেপিঠে। মরা ভেসে যে
কোথায় যাচ্ছে কারুর কোনো খোঁজ নেই।
পুকুর ডোবা জলা নদী। এত মাছের মৃত্যু
দিনুভাইয়ের চোখে জল এল।

– তুই খুব ভালো। তোর বউ নদীর
কাজে যায় না।

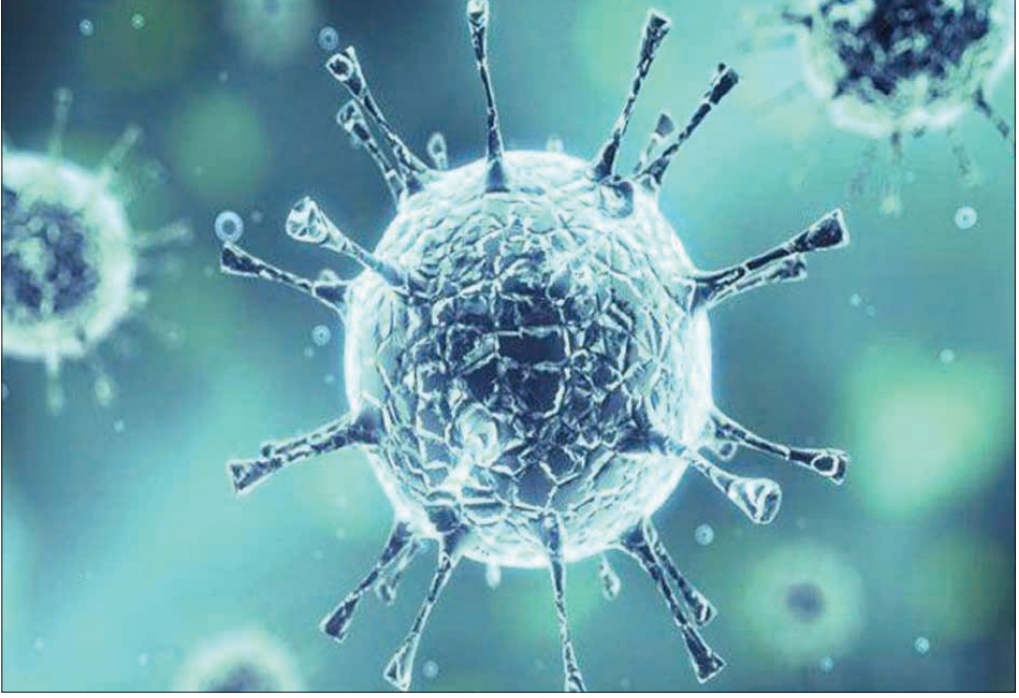
দিনুভাই মিটমিট হাসল। আজ পর্যন্ত
কোনো মেয়ে প্রশংসা করেনি। তার খুব
ভালো লাগছিল। গাছের পাতা জলে পচে
গেছে। হাপুসহপুস করে সাঁতরা ছিল।
পনামাছ, ছোট ছোট চিংড়ি মাছ মরে
পচে ভেসে গেছে। বোড়া সাপের খোলশ
ভেসে এসে দিনুভাইয়ের জড়িয়ে পড়ছে।
কলাগাছের ভেলাগুলো পচে ভাসছে
গাছের ঝাড়ে। কয়েকটা মাছ এখনো বেঁচে
আছে। গরু, ছাগল, মরে জল খেয়ে পেট
ফুলে গেছে। এত মৃত্যু এর আগে চোখে
দেখেনি দিনুভাই। জলের স্রোত আগের
থেকে বাড়ছে। এদিক-ওদিক করে ঘরবাড়ি
নেই। দূর থেকে একটা ভুঁটভুটি কাছ
এল। গোলাম নেমে এল। গোলাম লোকটা
বেশ ভালো। এখানকার বড় পার্টির নেতা।
জোড়াজোড়া বিবি তার। টু-শব্দ করে না
কেউ।

দিনুভাই গলায় জড়িয়ে নেয়।

– এখনো আটকে আচে গোলামসাব।
গোলাম হাসল। টিনুদাই বলল।

ভাবি চুপচাপ বসে হাসছিল দিনুকে
দেখে। দেখে হাসল।

অলঙ্করণ : বিশ্বজিৎ আইচ



করোনা ভাইরাস এবং পুঁজিবাদের নিরাপত্তাহীনতা

সি পি চন্দ্র শেখর

এ মনকি যখন মহামন্দার কারণে শ্লথ বৃদ্ধি হার স্থায়ী হয়ে যাচ্ছিল, বিশ্ব অর্থনীতি আরও একটি মন্দার সম্মুখীন হতে চলেছে। বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকটের সময়কাল থেকে সর্বনিম্ন হারে বিশ্বের জিডিপি বৃদ্ধি হার অর্ধেক শতাংশ পয়েন্ট কমিয়ে ২.৪ শতাংশ করে পূর্বাভাস জানিয়েছে ওইসিডি সচিবালয়। আশু সূত্রপাতের কারণ হল করোনা ভাইরাসের মহামারী যা বিশ্ব অর্থনৈতিক কার্যকলাপে বিঘ্ন সৃষ্টি করছে। কিন্তু ভাইরাসের প্রবল আক্রমণের মধ্যে একটি বৃহৎ বার্তাও ছড়িয়ে পড়ছে। বিশ্ব অর্থনীতির উপর যে ক্ষতির বোঝা

এটা চাপিয়ে দিয়েছে এবং আরও প্রায় নিশ্চিতভাবে যে ক্ষতি ক্রমশ বৃদ্ধি লাভ করবে, তা নয়া উদারনীতির যুগে যে নতুন করে নিরাপত্তাহীনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে তাকে উন্মোচন করছে যা বিশ্ব অর্থনীতিকে দুর্দশাক্রিষ্ট করে তুলেছে।

এই প্রবন্ধ রচনার সময় চীন, যা মহামারীর উৎসকেন্দ্র, জানিয়েছে আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় ৯০,০০০ এবং মৃত্যু হয়েছে প্রায় ৩০০০ জনের। একমাত্র শুভ সংবাদ হল এই যে সে দেশে নতুন করে আক্রান্তের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। কিন্তু তার বিপরীতে বিশ্বব্যাপী সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে।

ভাইরাসের সংক্রমণ ইতোমধ্যে ৬৩টি দেশে ছড়িয়ে পড়ার ঘটনা জানা যাচ্ছে এবং মৃত্যুর ঘটনা ক্রমশ বাড়ছে নতুন উৎকেন্দ্রগুলিতে যেমন ইরান, ইতালি এবং দক্ষিণ কোরিয়া।

শুরু থেকেই ভাইরাসের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ মারাত্মক ছিল শুধুমাত্র এই কারণে নয় যে তার বিষাক্ত প্রকৃতি, তার সঙ্গে বাস্তব হল যে এই মহামারী চীনের হুবহুই প্রদেশের উহান শহর থেকে ছড়িয়ে পড়েছে। ১৯৮০ সালের সময়কাল থেকে বিশ্ব অর্থনীতির রূপান্তরের ক্ষেত্রে তিনটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়েছে। প্রথমত, শিল্প উৎপাদনের বৃহৎ অংশ বাণিজ্য ও বিনিয়োগ নীতির উদারীকরণকে ব্যবহার করে পশ্চিমী দেশসমূহ ও জাপানের মতো পূর্বতন শিল্প পুঁজিবাদী কেন্দ্রগুলি থেকে সরে এসে, নতুন অঞ্চলে পুনঃস্থাপিত হয় যেখানে উৎপাদন ব্যয়ের সুবিধা লাভ সম্ভব হয়, বিশেষত সস্তা শ্রমের অফুরন্ত জোগানের ক্ষেত্রে। দ্বিতীয়ত, এর পরিণতিতে যে উৎপাদন শৃঙ্খল বিশ্বজুড়ে দ্বিমুখী অবস্থান ঘোষণা করে, কয়েকটি মাত্র দেশ এই স্থানান্তরের প্রক্রিয়ায় উপকৃত হয় অসমঞ্জস্যভাবে। চীন হল তাদের অন্যতম সামনের সারির দেশ, কাঁচামাল ও অন্তর্বর্তী বস্তু আহরণ করে এবং মধ্যবর্তী বস্তু ও চূড়ান্ত পণ্য উৎপাদন করে রপ্তানি করে শুধুমাত্র পশ্চিমী দেশগুলিতে নয়, বরং এর সঙ্গে নয়া শিল্পোন্নত ও অনুল্লত দেশসমূহে। তৃতীয়ত, চীনের এই বিশেষ অবস্থানের কারণে তার অর্থনীতি দ্রুত বিস্তার লাভ ঘটেছে, যা সৃষ্টি করেছে বিপুল মধ্য আয়কারী, ধনী ও অতি ধনী ব্যক্তি সমষ্টি যাদের ভোগ্যপণ্য ব্যয়ের বিকাশ লাভ ঘটেছে বিপুল হারে। এরফলে চীন যে বিশ্বের অগ্রণী কারখানায় পরিণত হয়েছে তাই নয় এবং তারই সঙ্গে চীনও বিদেশে উৎপন্ন পণ্যের গুরুত্বপূর্ণ বাজার হিসেবে ক্রমশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বিশ্ব অর্থনীতির এই বহুমুখী রূপান্তরের ফলে নতুনভাবে নিরাপত্তাহীনতার সৃষ্টি হয়েছে। চীনের ভোগ্যপণ্যের চাহিদাকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে এমন কোনো ঘটনাপ্রবাহ বা চীনের উৎপাদন শিল্পে প্রতিহত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় চাহিদা ও জোগানের ক্ষেত্রে, তাহলে এর প্রভাব বিশ্বের বাকি অংশকেও গভীরভাবে নাড়িয়ে দেয়। এটা ২০০৩ সালেও পরিষ্কার হয়েছিল, যখন সার্স মহামারীর ক্ষতিগ্রস্ত প্রভাব চীনা অর্থনীতিতে প্রতিফলিত হয় ও তা বিশ্ব অর্থনীতিকেও প্রভাবিত করে। কিন্তু তার পরবর্তীতে বহু পরিবর্তন হয়েছে, বাস্তব হল এটাই যে ২০০৩ সালে যখন সমগ্র বিশ্বের জিডিপি-র মাত্র ৪ শতাংশ ছিল চীনের, বর্তমানে ১৬ শতাংশ।

মহামারীর আশু প্রভাব অবশ্যই চীনের অর্থনীতির ওপর পড়ে। যেহেতু সংক্রামক রোগের কারণে কারখানাগুলিকে বন্ধ করতে হয় এবং সরকারকে শহরগুলিতে লকডাউন ঘোষণা করতে হয়, উৎপাদন ব্যাপক হ্রাস পায়, তৎসহ কর্মসংস্থান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়াও, কাজের সন্ধানে ভ্রমণ বা ছুটির অবকাশে ভ্রমণ স্তব্ধ হয়ে যায় (বিশেষত পরিযায়ী শ্রমিকদের গণ চলাফেরা চান্দ্রমাস নববর্ষ উদযাপন উপলক্ষে)। ফিন্যান্সিয়াল টাইমসে প্রকাশিত সংবাদ অনুসারে, চীনের বিমান পরিবহন মন্ত্রকের পরিসংখ্যান হল চান্দ্রমাসের নববর্ষের অবকাশের শেষ অর্থাৎ ২৭শে জানুয়ারি থেকে

১২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চীনা বিমান পরিবহন সংস্থাগুলির যাত্রী সংখ্যা গত বছরের ঐ সময়ের তুলনায় ৭০ শতাংশ কম। এরফলে প্রায় ৭০ শতাংশ বিমানের যাত্রা বন্ধ হয়ে যায়, যা কর্মসংস্থান ও ঐ শিল্পের আয়ের ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে একইরকম প্রভাবের কারণে বৃদ্ধি হ্রাস পাওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে, একসময়ের বৃদ্ধিপ্রবণ চীনা অর্থনীতিতে, ২০২০ সালে ৫ শতাংশের কম বৃদ্ধি হতে পারে।

চীনে বিকাশ ও চাহিদার অনিশ্চয়তার কারণে, নিরাপত্তাহীনতার প্রভাব উদ্ভূত হচ্ছে বিশ্বের উৎপাদন ব্যবস্থার অসমতার বিশ্বায়নের ফলে, তা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। ২০১৯ সালে, বিশ্বে তেলের চাহিদা বৃদ্ধির তিন-চতুর্থাংশ হয়েছে চীনের জন্য। আন্তর্জাতিক শক্তি সংস্থার উপসংহার হল—“কোভিড-১৯ (করোনা ভাইরাস)-র জন্য বিশ্বে তেলের চাহিদার ক্ষেত্রে প্রভাব হবে তাৎপর্যপূর্ণ।” তারা ২০২০ সালে বিশ্বে তেলের চাহিদা দৈনিক আনুমানিক ৮,২৫,০০০ ব্যারেল হিসেব করেছে পূর্বতন ১২ লক্ষ ব্যারেলের তুলনায়। চাহিদার হ্রাস এবং আরও চাহিদা হ্রাস পাওয়ার আশঙ্কায় ব্রেস্ট ক্রুডের মূল্য হ্রাস পেয়েছে, অপরিশোধিত তেলের মাপকাঠি, বছরের শুরুতে ৬৯ মার্কিন ডলার থেকে প্রায় ৫০ ডলারের কাছাকাছি। তেল রপ্তানিকারক দেশগুলি এরফলে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হবে, বিশেষ করে রাশিয়ার মতো দেশ যেখানে সরকারি রাজস্বের হিংসভাগ জোগান আসে তেল বিক্রির অর্থ থেকে। বিশ্বায়নের পৃথিবীতে এক স্থানের ক্ষতির প্রভাব অন্য স্থানেও সমস্যার সূত্রপাত করে।

কিন্তু ক্রমহ্রাসমান চাহিদার প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ অন্তর্বর্তী সামগ্রী যেমন তেলক্ষেত্রকে ছাড়িয়েও সুদূরপ্রসারী হয়। চীনা পর্যটকরা, যারা সারা বিশ্বজুড়ে ভ্রমণ করে থাকেন চান্দ্রমাস নববর্ষের অবকাশের সময়কালে, তারা বিমান টিকিট বাতিল করছেন কারণ তারা নিজেদের বাড়ি ছেড়ে বেরতে পারছেন না বা তাদের বহু দেশে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে, দেশগুলি তাদের সীমান্তে মহামারী ছড়িয়ে পড়া রোধ করতে চাওয়ার কারণে। এর প্রতিক্রিয়ায়, বিমান পরিবহন শিল্প, ভ্রমণ ব্যবসা ও অভিজাত ব্র্যান্ডের পণ্যের বাজারে সংস্থাগুলি যারা চীনা ক্রেতাদের জন্য হাঁকডাক করত হঠাৎ করে চাহিদায় ভাটা লক্ষ্য করেছে। শিল্পের হিসাব অনুসারে, ২০১৯ সালে বিলাস পণ্যের ২৮০ বিলিয়ন ইউরো বাজারের দুই-পঞ্চমাংশ ব্যয় করেছেন চীনা ক্রেতারা শুধুমাত্র তাই নয়, বরং বিক্রির বৃদ্ধি হারের ৮০ শতাংশ চীনা ক্রেতাদের জন্যই হয়েছে।

এই ধাক্কা, যাইহোক, শুধুমাত্র চাহিদার দিক থেকে হয়েছে তা নয়। বিশ্বের বহুবিধ মূল্য-শৃঙ্খলে চীনের মুখ্য ভূমিকার প্রেক্ষিতে, অন্তর্বর্তী বস্তুর ও চূড়ান্ত পণ্য উৎপাদনের সরবরাহকারী হিসেবে, দেশজুড়ে ভাইরাসজনিত কারণে উৎপাদন স্তব্ধ হয়ে যাওয়ার সুদূর প্রতিক্রিয়া বিশ্বজুড়ে পরিলক্ষিত হবে। চিরকালীন টগবগে স্মার্টফোন শিল্প, যেখানে মার্কিনী বৃহৎ সংস্থা অ্যাপল-র আইফোন থেকে চীনের নিজস্ব শিয়াওসি ভরসা করে চীনের কারখানাগুলিতে উৎপাদিত পণ্যের ওপর। এর মধ্যে কয়েকটি রয়েছে উহানে, হঠাৎ

করে সরবরাহে ঘাটতি লক্ষ্য করছে, যারজন্য অ্যাপল বাধ্য হচ্ছে তাদের পরবর্তী উন্নত প্রযুক্তির পণ্য বাজারজাত করার পরিকল্পনা মূলতুবি রাখতে। অন্য উদাহরণস্বরূপ, সমস্যা চূড়ান্ত উৎপাদিত পণ্যের উপলব্ধির ক্ষেত্রে নয়, বরং চীন থেকে আসা যন্ত্রাংশ ও তার অংশবিশেষ উপলব্ধ না হওয়া। ফিয়ার্ট ক্রাইসলার ঘোষণা করেছে যে তারা উৎপাদন ছাঁটাই করবে আমদানিকৃত যন্ত্রাংশের সরবরাহ হ্রাস পাওয়ার কারণে। ভারতে ওষুধ উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে ও মূল্যবৃদ্ধি ঘটছে, কারণ ওষুধ প্রস্তুতের বেশিরভাগ উপকরণ চীন থেকে আমদানি করা হয় যা এখন উপলব্ধি হচ্ছে না।

অনিবার্য হিসেবে, বিশ্বের উৎপাদন ক্ষেত্রে এই বিপর্যয় চীনে করোনা ভাইরাস মহামারীর কারণে চাহিদা ও জোগানের ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা অনুভূত হওয়ার ফলে, উৎপাদন, কর্মসংস্থান এবং আয় হ্রাস পায়, যা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির ক্ষেত্রে অনুঘটকের কাজ করে, চীন থেকে উদ্ভূত প্রাথমিক দাব্বার বিস্তারে সহায়ক হয়ে ওঠে। এর পাশাপাশি, করোনা ভাইরাস মহামারী আর শুধুমাত্র চীনের ঘটনা হয়ে থাকছে না, ইরান, ইতালি এবং দক্ষিণ কোরিয়াতে তীব্র আকার ধারণ করছে এবং ইঙ্গিত দিচ্ছে নতুন উৎকেন্দ্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার। যেহেতু এদেশগুলিতেও চীনের মতো একই পরিণতি পরিলক্ষিত হবে অন্য অর্থনীতির ওপর তরঙ্গায়িত প্রভাবের ক্ষেত্রে (চীনের মতো এতটা প্রবল না হলেও)। এদেশগুলি শুধুমাত্র বিস্তারকের ভূমিকা পালন করবে না তারা নিজেরাই চালকের আসনে আসীন হবে। এ সমস্ত কিছু একটা ধারণা দেয় যে মন্দা আসন্ন এবং আত্মতুষ্টির কোনও অবকাশ নেই।

আর্থিক বাজারে বিনিয়োগকারীদের মতো আত্মতুষ্টি আর কোথাও দেখা যাবে না, তারা সহজে বিনিয়োগ প্রত্যাহার করার সুযোগে আত্মবিভোর যা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কসমূহ তাদের অর্থনীতিতে প্রভূত পরিমাণে দিয়েছে। নয়া-উদারনীতি আর্থিক নীতি সহজলভ্য অর্থে ব্যবহার করে যে পথ অনুসরণ করে, তারা শেয়ার বাজারে বাজি ধরে যা থেকে মনে হয় যে সুখের দিন শেষ হবে না। শেয়ার বাজারে দীর্ঘ মন্দা-পরবর্তী উত্থান স্থায়ী ছিল যদিও করোনা ভাইরাস বিশ্বজুড়ে ক্রমবর্ধমান সংখ্যক মানুষকে আক্রান্ত করেছে। ২০শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্তও, বিশ্লেষকরা এমনকি সর্বদা আশাবাদী গোল্ডম্যান স্যাচে সতর্ক করছিল যে বিনিয়োগকারীরা ভাইরাসের প্রতিক্রিয়া তাদের আয়ের উপর কী পরিমাণে পড়তে পারে তা অবজ্ঞা করছেন। তাদের যুক্তি ছিল যে এরফলে বাজারে “সংশোধন” হতে পারে, বা বাজারে সূচক ১০ শতাংশ বা তার বেশি পতন হতে পারে, আশঙ্কা “মারাত্মক”। যখন বাজারের অন্যতম পছন্দের অ্যাপল তাদের পূর্বতন পূর্বাভাসের থেকে আয় হ্রাস পাবে, বা এমনকি নিচে নামতে পারে, তখন বিনিয়োগকারীরা সতর্ক হয়ে গেলেন, যারফলে

প্রথমসারির সূচকগুলি ২৮শে ফেব্রুয়ারি শেষ হওয়া সপ্তাহজুড়ে পতন শুরু হয়।

শেয়ার সূচক যে উচ্চতায় পৌঁছেছে তাতে এটা হতে পারে যে সবেমাত্র শুরু। শেয়ার সূচকের তীব্র পতনের প্রতিক্রিয়া চালু অর্থনীতিতে পড়তে পারে তা ২০০৮ সালের আর্থিক মন্দার সময় পরিলক্ষিত হয়েছে। একইরকম ঘটনাপ্রবাহের বাস্তবিক সম্ভাবনা রয়েছে, বিশেষ করে যদি করোনা ভাইরাসের জন্য সৃষ্ট আর্থিক সঙ্কট গভীর হয়। আর্থিক ভঙ্গুরতার এটাই একমাত্র উপাদান নয় যা আজকের ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য বিশেষ। কয়েক দশক ধরে যখন সহজলভ্য অর্থ শেয়ার বাজারে অটেল জোগান এসেছে অস্বাভাবিক আর্থিক নীতির ওপর অতিরিক্ত আস্থা রাখবার জন্য (পরিমাণগত স্বাচ্ছন্দ্য ও সুদের হার হ্রাস পাওয়া), কর্পোরেট ক্ষেত্র তখন বিপুল পরিমাণ ঋণ গ্রহণ করেছে। এদের অনেকের ক্ষেত্রেই, করোনা সঙ্কটের জন্য যে চাপ সৃষ্টি হবে, তাতে সুদ প্রদান ও ঋণ পরিশোধ করার বোঝা দৃষ্টির হয়ে উঠবে। এর পরিণতিতে ঋণখেলাপি বাড়বে যারফলে আর্থিক সংস্থাসমূহ ও ব্যাঙ্কগুলি ক্রমশ রুগণ হয়ে পড়বে। এটা আরও একটা কারণ হবে যার থেকে সঙ্কট আরও তীব্র হতে পারে। নয়া উদারবাদী ও তার অর্থনৈতিক নীতিসমূহ এই ভঙ্গুরতা সৃষ্টি করে যা নয়া উদারবাদী বাণিজ্য ও বিনিয়োগ নীতিসমূহ এবং তাদের উৎসাহদানের মাধ্যমে সৃষ্ট অসমঞ্জস্য বিশ্বায়নের ফলে।

মন্দার আশঙ্কা, এক গভীর মন্দার আশঙ্কা, ভীতি জাগাচ্ছে এই কারণেও যে সরকারগুলি এধরনের সঙ্কট নিরসনে হস্তক্ষেপের ক্ষেত্রে তাদের কার্যকারিতা ক্ষয় পেয়েছে বলেই মনে করা হচ্ছে। নয়া উদারবাদকে আলিঙ্গন করার ফলে কার্যকরী আর্থিক নীতি অনুসরণ করায় স্বল্পসংখ্যক ক্রেতাই পাওয়া সম্ভবপর যা সঙ্কটের সময়কালে ধার করে অর্থের জোগান অব্যাহত রাখতে হবে, প্রভাবশালী নীতি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে। অন্যদিকে, আর্থিক নীতিসমূহের উপর অতিরিক্ত আস্থা রাখার ফলে সুদের হার সর্বনিম্ন স্তরে পৌঁছেছে তাই নয়, তা ইন্ধন জুগিয়েছে ফাটকাবাজির কাল্পনিক উন্মাদনাকে সম্পদের বাজারে, চাহিদা বৃদ্ধি করার পথে না গিয়ে এবং চালু অর্থনীতির বিকাশ সহায়ক না হয়ে। পরিণতি স্বরূপ, মন্দার আশ্রাসন মোকাবিলায় প্রধানত নিষ্ক্রিয় আর্থিক উপায় ব্যবহারের সুযোগ অত্যন্ত সীমিত। করোনা ভাইরাস, মানবশরীর ও জীবনে যে ধ্বংসের হানিকর পরিস্থিতি নামিয়ে এনেছে, তাতে শুধুমাত্র নয়া-উদারবাদী আর্থিক কাঠামোর ভঙ্গুরতা উন্মোচন করছে তাই নয়। তা নয়া উদারবাদী সরকারগুলির ক্ষমতাকে পরীক্ষার সম্মুখীন করেছে বিশ্ব অর্থনীতিকে রসাতল থেকে উদ্ধার করার জন্য যার মধ্যে অনেকটাই নিমজ্জিত হয়ে গেছে।

অনুবাদক : অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়

ক বি তা

তার সঙ্গে কথা নেই

ব্রতী ঘোষরায়

তার সঙ্গে কথা নেই সে এক আশ্চর্য দীপালোক
আলোছায়া সঙ্গে নিয়ে ঘোরে
কাকে বা আলোক বলে, কে-ই বা ছায়ার মায়া ধরে
তার সঙ্গে সব কথা ফুরিয়েছে, তবুও অবাক ঘরবাড়ি
ফুলের মতন ফোটে সুগন্ধ ছড়ায় ডেকে যায়
তাকেই কেবল
আমি তো লিরিক লেখা শিখিনি তেমন
গদ্যগন্ধ কবিতারা নরম অক্ষর চিনে নেয়
সেই স্বরে যা কিছু গানের রেশ, যা কিছু আঙুলে গোনা যায়
সব দিয়ে কথা বলা তবুও সে দীপালোক কথায় বিমুখ
কতদিন হয়ে গেল অথচ তো ফেরেনি জীবন
তেমনি অবাক হয়ে ভেবে নিই সে বড় আশ্চর্য খেলা খেলে
জীবন যেমন থাক তেমনি চলুক রাতদিন আলোছায়া
সঙ্গে নিয়ে সেই দীপালোক কেন যে বিমর্ষ হয়
কেন যে পুরোনো কথা মুছে নিতে এত ভুল করে
কথা নেই কথা নেই সে আশ্চর্য অমোঘ মায়ায়।

এই যেভাবে নাগরদোলা

ঋতু চট্টোপাধ্যায়

যতবার অঙ্কে ভুল করি, ততবার নক্ষত্র জন্ম হয়,
গ্রাহফের ওপর নতুন অক্ষ, জন্ম মাত্রই ভুল তথ্য
দিয়ে আরেকটা জন্মের সূত্র ধরা।
এরপর উস্কা জন্ম দেখে যেতেই পিছনের ডাক আসে।
এক একটা শেকল থেকে আরেকটা ছটফটানি,
তারপর মৃত্যুর মতো একটা কিছু।
এদের নাকি নাড়ি নক্ষত্রে টিকি বাঁধা।
শরীরে বাঁশ ঝাড়, আরেকটা যাযাবর
দলের সাথেই নতুন জায়গা ভাগের চেষ্টা
থেকেই সমীকরণের রাহুমুক্তি।
এসবের পরেও উত্তর মেলাবার চেষ্টাতেই
একটা গলি ছেড়ে আরেকটা গলিতে ঘোরা।

আলো

কনক ঠাকুর

অন্ধকার ভেঙে ভেঙে
আলোকে খুঁজেছি
কোথাও পাইনি তার সামান্য রেখা
ভিতরে জড়ো হয়েছে মেধা।

একা নয়, তোমার সঙ্গে ঘুরেফিরে
পেয়েছি বন্ধু
শরীরে জড়িয়ে পড়েছে অনুভব
এখন সেই রাত আর নেই।

সামনেই রমজান আলির বাড়িঘর
নারকেল গাছ হীরামতীর ঝিল
খুঁজে পেয়েছি সমস্ত কিছু
অন্ধকার ভেঙে নয়
আলোর মধ্যেই আলো থাকে।

যাচাই

সোমনাথ রায়

যাচাই করিনি তুমি সত্যি নাকি মিথ্যা
ভরসা করে মাছ ধরতে কেঁচোও তুলিনি মাটি খুঁড়ে
বিষধর নাকি ঢ্যামনা, কী জানি কী আছে কার মনে
একটা ছিপ আর একটা শাবল আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়েছ
আমাকে যাচাই করে ঘরে ফিরতে হবে

এর আগে প্রতিবার আমি খালি হাতেই ফিরেছি
ওরা বলছে নাকি, মাটি শুঁকেই এখন বলা যায়
গর্ত ফুঁড়ে কে বেরবে। বাতাসই আসল
বুদবুদ দেখেই বোঝা যায়, কোন সাইজের মাছ
জলের তলায় আছে। বাতাসের রহস্য এটাও

এখন ক্রমশ দম বন্ধ দশা অনুভব করছি
জেলে ও সাপুড়েদের তরঙ্গা শুনছি
তারা জাল আর বাঁপি নিয়ে দৌড়ে বেড়াচ্ছে আশপাশ
মর্গের দুয়োরে কেউ কারও পরিজন নয়, সকলে শিকারি।

ব্রত

বিকাশ চন্দ

দলছুট সময়ের মেঘ কালো সাদা নীলে—
টুকরো টুকরো বিশ্বয়ের চাঁদ নেমেছে—
পুব পাড়ার ঝিলে,

ঘূর্ণি সময়ের টানে ভেতরে রঙের মিছিলে—
মৃত স্বপ্নেরা কথা বলে আমাকে বেঁধেছে
শুকনো মাঠে বিলে।

শরীরে ভিজেছে প্রতি ঠোঁকরে রক্তবীজে
নদী ঘাট মাঠ হয় তো বা সব জেনেছে—
যা কিছু সব মনসিজে,
বাঁশিহীন সকালে আকালের পথ কী যে
বলেছিল করজোড়ে ভয় কে মেনেছে
রাত দিন ঘাম রক্তে ভিজে।

ওপারের ডাকে ভেঙেছে মানুষের ঘর যত
হাতে হাত রাখতে পারি অক্ষত—
জন্মঋণ কেড়েছে জনপথে,

রক্তক্ষরণ মননে বরণে চলেছে অবিরত—
তবুও তো আত্মসুখে কঠিন ব্রত
জনপদ ভেজে রক্ত স্রোতে।

খিদের সংক্রমণ

মিঠু নাথ কর্মকার

জানলার বেড়া ভেঙে ঢুকে পড়া জ্বলন্ত চাঁদের স্ফুলিঙ্গ,
গুঁজে দিই বহুদিন আগুন না পাওয়া উনুনের মুখে...

উষ্ণ আঁচের চুমু শুষে নেয় স্যাঁতস্যাঁতে অভিমান,
উপোসি হাঁড়িপেটে বেড়ে ওঠা যন্ত্রণাই জানে;
আগুন ও অপেক্ষার ঋণ...

অঙ্গারের পাকস্থলী জুড়ে খিদের সংক্রমণ...

বাবা

শ্রীনিবাস অধিকারী

কোনোদিনই সবটুকু বাবাকে পাওয়া যায় না।

বাবারা চিরকাল আগেছালো হয়। তারা ঠিকিঠাক জুতোমোজা পরে না।
চুল আঁচড়াতে ভুলে যায়; বোতাম আটকাতে গেলে ঘর ওলটপালট করে ফেলে।
জীবনের আসল আসল দিনগুলো কক্ষনো মনে রাখার চেষ্টা করে না।
চোখেমুখে থম মেরে থাকা নিম্নচাপের পূর্বাভাস লুকোতেই ব্যস্ত থাকে সকল সময়।

শুরুর দিকে শীতের কামড় বুঝতে দেয় না; নির্মেঘ চোত-বোশাখের খরতাপে বাবা
এক নিশ্চিত ছায়া
জষ্টির ঝঞ্ঝা, আষাঢ়ের প্রথম করকাপাত বা মেঘফাটা বৃষ্টির দাপটে নির্ভরতার জন্য
একজনই তো আছে। যেকোনো টালমাটাল উতরে দিতে ওই বুলে-পড়া বিশ্বস্ত কাঁধ
মরুভূমির উটকেও অনায়াসে টেকা দিতে পারে।

সংসারে বাবাদের কোনো অভাব থাকতে নেই; কারো বিরুদ্ধে কথা বলার আগে তারা
এতবার ভাবে যে শেষমেষ অশক্ত আঙুল উঠতে চায় না। বরং আমাদের চার দেয়ালের
কুরক্ষত্র বাবাদের জন্য ভীষ্মের মতো অভিযোগের শরশয্যা পেতে অপেক্ষায় থাকে।

কাঠফাটা রোদ্দুর আর পিচগলা রাস্তা শরীরের সব ঘাম নিংড়ে নেয়; ইট-পাথরে ক্রমাগত
ঠোকর খেতে খেতে পা ফেটে রক্ত বরার পর যতটুকু পড়ে থাকে— সেটুকুখানিই বাবা।

এই অমানুষিক হাপরটানা দিন আর নিখুম ঝড়ঝাপটার রাত বাবাদের কখনো পুরোপুরি
বাবা হতে দেয় না।

নিরুদ্দিষ্ট সম্পর্কে ঘোষণা

সুমন চট্টোপাধ্যায়

মিথ্যার ইশারা তাকে পাঠাতে পারেনি কোনো ছদ্ম প্রশান্তির দেশে
প্রতিশ্রুত গোলাপের ঘ্রাণ তাকে করেনি স্বপ্নাবিষ্ট
সে শুধু বাস্তবের এক অশেষ মিছিলে হেঁটে হেঁটে
প্রতিদানে ফিরিয়ে দিচ্ছে কৈশোরের প্রথম নিষ্পাপ চুম্বনের স্বাদ

আজ যদি তাকে তুমি খোঁজো, যদি ফিরে পেতে চাও অতীতের
সহজ মায়ায় তবে তুমি জেনে রাখো বহুদিন
নিজস্ব স্বপ্নের ঘরবাড়ি আর নিয়তির কয়েদখানা
তাকে লুকিয়ে রেখেছে কোনো স্তব্ধ দুপুরের ভাঁজে অবিকল

আজ যদি তাকে তুমি ডাকো, যদি ফিরে পেতে চাও সমুদ্রের
টেউয়ের ফেনায় তবে তুমি জানো, তুমি শিখে রাখো
দৃশ্যের ওপর দৃশ্য গাঢ় হয়ে এলে কীভাবে
মেঘের শরীর বেয়ে হেঁটে যায় সন্দের বেড়াল...

প্রতিদিনের কবিতা

বিরূপাক্ষ পণ্ডা

অন্যসুখে বাসাবদল দিন যায়
নামতার মতো
কে সুখী কে দুঃখী কে যে মধ্যবর্তী
থেকে যায় পুরু মুখোশে।

আড়ালের সেই গল্প
হেঁয়ালি ভেবে
এড়িয়ে যায় সই
বাঁকা পথে চলছে কেউ কেউ
কেমন যেন ন্যাওটা সব।

দুঃসময় তুমি থাকো চিরকাল
সিংহাসনে ভালো সন্ন্যাসী জাল।

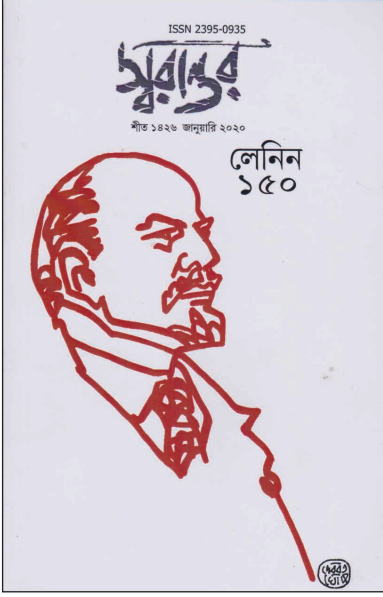
বিষাদ জল

তন্দ্রা ভট্টাচার্য

অনেক বন্ধু হল বিষাদ জল মেখে
এখন কৌটো ভরে খানিক স্বস্তি
নিজেকে তুলে রেখে।
খুঁজি যাদের ভীষণ খুঁজি
তারা অচেনা এক দারুণ জ্বরে
আমায় দেখলে ওরা ঔষধ খায়
ওরা জীবানু তাড়ায়।
সঙ্গদোষে ওদের বন্ধু আছে ঘর বোঝায়
খুঁড়ে যাই মনের মতো, জলটুকু পাব বলে
কিছু না পেলে নিজেকে পোড়াই।
ছাইভদ্র যা থাকে আমার সাজানো তাকে
এখন একটা কৌটো পালে নিজেকে লুকোই।

লিটল ম্যাগাজিন সত্য জি ৭ বন্দ্যোপাধ্যায়

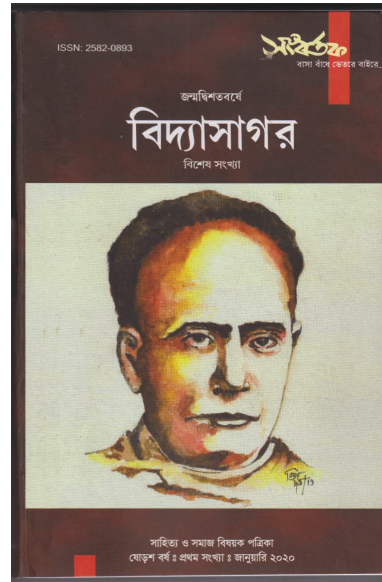
‘স্বরাস্তর’, লেনিন ১৫০, সম্পাদক:
দ্বিজেন্দ্র ভৌমিক, কল্যাণ নগর,
পানশিলা, কলকাতা ৭০০১১২,
ফোন: ৯৪৩২১৬৫১৬৯



লেনিনের ১৫০তম জন্মবর্ষ উপলক্ষে প্রকাশিত সংখ্যাটিতে লেনিনকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়েছে ও মূল্যায়ণ করা হয়েছে। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ লেখার অনুবাদ আছে। লেনিনের ডায়েরির একটি পাতা ও অল্প হলেও ভালো, কিন্তু ভালো কোরে, অ্যালান ব্যাজু-র ১৯১৭-র রুশ অক্টোবর বিপ্লব, টেরি ঈগলটন-এর উত্তর-আধুনিকতার যুগে লেনিন, স্লাভয় জিজেক-এর আজকের সংকটের সমাধান: একটি লেনিনীয় দৃষ্টিভঙ্গি, ও লোরেঞ্জা চিয়েসা-র লেনিন ও বিপ্লবী রাষ্ট্র প্রবন্ধগুলির অনুবাদ করেছেন সুচেতনা চন্দ, তাপস গঙ্গোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্র ভৌমিক, ঐন্দ্রিলা মাইতি সুরাই, সন্ধি চক্রবর্তী। এরসঙ্গে রয়েছে লেনিন ও লুক্সেমবুর্গ, লুকাচের চোখে লেনিন, লেনিনের ভাবনায় গণতন্ত্র, হোয়াটসঅ্যাপের যুগে ‘হোয়াট

ইজ ইজ টু বি ডান’, লেনিন ও ট্রটস্কি, লেনিন ও গ্রামশি : ১৯১৭-১৯২৬, লেনিন ও পাতলভ, দার্শনিক লেনিন: দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের মূল্যায়ণ, লেনিন ও অক্টোবর বিপ্লব, সোভিয়েত সিনেমার স্বর্ণযুগ: নেপথ্যে লেনিন, অন্য লেনিন: সমাজতন্ত্রে বিজ্ঞানের স্বাধীনতা ও প্রকৃতির স্বতন্ত্রতা, লেনিন : আধ্যাত্মিকতা, চেতনা, ধর্ম ও নাস্তিকতা বিষয়ে লিখেছেন বিনোদ মিশ্র, রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, শোভনলাল দত্তগুপ্ত, দীপঙ্কর ভট্টাচার্য, কুনাল চট্টোপাধ্যায়, বাসুদেব মুখোপাধ্যায়, শুভেন্দু সরকার, রুণা মিশ্র, নবীনানন্দ সেন, তুষার চক্রবর্তী, অমিত সরকার প্রমুখ।

‘সংবর্তক’, বিদ্যাসাগর বিশেষ সংখ্যা, সম্পাদক : সৌরভ রঞ্জন ঘোষ, বি-১২৯, বৈষ্ণবঘাটা পাটুলি টাউনশিপ, কলকাতা ৭০০০৯৪, ফোন : ৯৪৭৭৪৭১০০৭



প্রায় ৭০০ পৃষ্ঠার সংখ্যাটি অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যা। শঙ্খ ঘোষ লিখেছেন বিদ্যাসাগরকে জানা, এছাড়াও তার

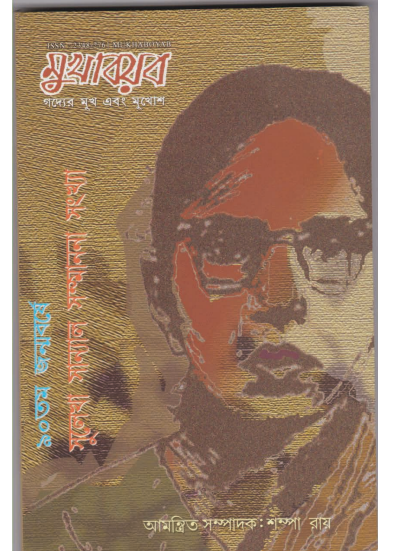
ব্যক্তিত্ব, ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে লিখেছেন – রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য : বিদ্যাসাগরের ‘চুড়ান্ত বস্তুবাদ’ আর না-ধর্মীয় ভাব, পবিত্র সরকার : শিক্ষক বিদ্যাসাগর, অত্র ঘোষ : একাকী বিদ্যাসাগর ও ‘বীরসিংহ জননীর পত্র’, চন্ডিদাস ভট্টাচার্য : ‘তিনি যথার্থ মানুষ ছিলেন’, শ্যামল চক্রবর্তী : রবীন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দর ও অন্নদাশঙ্করের চোখে বিদ্যাসাগর, আশিস খাস্তগীর : বিদ্যাসাগর ও ব্রাহ্মসমাজ, মৃদুল দাস : বিদ্যাসাগর ও ধর্ম, সুব্রত গৌড়ী : ভারতীয় নবজাগরণ – রামমোহন থেকে বিদ্যাসাগর, সৌমিত্র বন্দ্যোপাধ্যায় : ভারতে যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞানচর্চার জনক বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগরের ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে আলোচনা করেছেন -- বিকাশকান্তি মিদ্যা : বিদ্যাসাগর – বাংলা গদ্যে ভোরের পাখি, সুমিতা চক্রবর্তী : বিদ্যাসাগর ও অনুবাদ, সৌমিত্র বসু : বিদ্যাসাগরের নাট্যানুবাদ, রাজীব চক্রবর্তী : বিদ্যাসাগরের সংস্কৃত চর্চা, অর্ণব নাগ : বিদ্যাসাগরের গ্রন্থাগার, অমিতাভ মুখোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগরের ‘শব্দসংগ্রহ’, স্বরোচিষ সরকার : বাংলা লিপির বিকাশে বিদ্যাসাগরের অবদান। শিক্ষা ও সমাজ ভাবনা নিয়ে লিখেছেন -- গোপা দত্তভৌমিক : বিদ্যাসাগর ও মেট্রোপলিটান কলেজ, শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর ও ইয়ং বেঙ্গল, অনিন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায় : কৌলিন্য প্রথা ও বিদ্যাসাগর, রমেনকুমার সর : সংস্কৃত কলেজ ও বিদ্যাসাগর, অশোক চট্টোপাধ্যায় : উনিশ শতকের প্রথম মধ্যশ্রেণীর রাজনৈতিক সংগঠন ও বিদ্যাসাগর, শঙ্কর কুমার নাথ : একটি ছাত্র ধর্মঘট, কলকাতা মেডিকেল কলেজ ও বিদ্যাসাগর, প্রসূন ধর : বিদ্যাসাগরের ‘কান্ডজ্ঞান’। বিদ্যাসাগরকে বিভিন্ন ব্যক্তির সম্পর্কের আলোয় ও সমকালের দৃষ্টিতে পর্যালোচনা করেছেন -- কনিষ্ক চৌধুরী : বিদ্যাসাগর, রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ, প্রশান্ত ধর :

বিদ্যাসাগর ও মার্শাল সাহেব, সৌরভ রঞ্জন ঘোষ : বিদ্যাসাগর ও মদনমোহন, নীলাঞ্জন মিশ্র : বিদ্যাসাগর ও মাইকেল মধুসূদন দত্ত, অনিন্দ্য গুহ : বিদ্যাসাগর-মহেন্দ্রলাল সম্পর্ক, শঙ্খদীপ ভট্টাচার্য : পিতা-পুত্র বিসংবাদ - বিদ্যাসাগর ও নারায়ণ, শ্রুত্যানন্দ ডাকুয়া : বিদ্যাসাগর-উইল - প্রেক্ষাপট ও পরিণতি, আশীষ লাহিড়ী : ‘ঘর-জ্বালানে’ বিদ্যাসাগর, অংশুমান রায় : সমকালীন বাংলার বুদ্ধিজীবী ও বিদ্যাসাগর, অনিন্দিতা চৌধুরী : সমকালীন নারীদের চোখে বিদ্যাসাগর। বাংলার বাইরে বিদ্যাসাগরের প্রভাব সম্পর্কে সাতটি প্রবন্ধের অনুবাদ আছে -- সন্তোষকুমার অধিকারী, (অনুবাদ নূপুর রঞ্জন ব্যানার্জী) : ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে ও বিদেশে সমাদরে বিদ্যাসাগর, মধুসূদন রাও (অনুবাদ নূপুর রঞ্জন ব্যানার্জী) : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, জে এম মোহান্তি (অনুবাদ কাজল গাঙ্গুলী) : বিদ্যাসাগর ও ওড়িয়া সাহিত্য, যশবন্ত শুল্লা (অনুবাদ সন্দীপন গাঙ্গুলী) : গুজরাটে সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বিদ্যাসাগর, এইচ এস ডোরাস্বামী (অনুবাদ সন্দীপন গাঙ্গুলী) : বিদ্যাসাগর কন্নড় সাহিত্য ও সমাজের প্রেক্ষিত, জার্মান প্রাচ্যবিদদের চোখে বিদ্যাসাগর বিষয়ে দুটি লেখা (অনুবাদ পার্থ চট্টোপাধ্যায়) : ওয়েবারের পত্র এবং বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগর-এর সাহিত্যিকৃতি। শিক্ষা ও সমাজ নিয়ে লিখেছেন -- সৌরভ রঞ্জন ঘোষ : বিদ্যাসাগর ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, তরুণ বসু : বাংলার নাট্যক্ষেত্র নটী ও বিদ্যাসাগর, সুস্মিতা দাশ : বিদ্যাসাগর বাঙ্গালীর ইতিহাসচেতনার প্রথম যুগ, ঋতায়ন চট্টোপাধ্যায় : হিন্দু অ্যানুয়িটি ফান্ড ও বিদ্যাসাগর, পূর্ণেন্দু শেখর মিত্র : বিদ্যাসাগর, সোমপ্রকাশ পত্রিকা ও বাংলার কৃষক সমাজ, সুদীপ্তা রায়ধর : নারীমুক্তির অগ্রদূত, বিদ্যাসাগর ও আজকের মেয়েরা, সুপ্তি মিত্র : স্ত্রী শিক্ষার বিস্তার - বিদ্যাসাগরের অনন্য প্রয়াস। পুনর্মূদ্রণ অংশে রয়েছে -- ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (অনুবাদ নূপুর রঞ্জন ব্যানার্জী) : বাংলায়

নারী শিক্ষার বিস্তারে বিদ্যাসাগরের ভূমিকা, মনীন্দ্রকুমার ঘোষ : N P P অর্থাৎ না পড়ে পড়িত, সৌরীন ভট্টাচার্য : বিদ্যাসাগরের যুক্তিবিন্যাস - বিধবাবিবাহ বিষয়ক প্রথম প্রস্তাব, রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য : মুর্খ বড়, আধুনিক নয়, অথবা প্রোজেক্টেস-এর খাটে বিদ্যাসাগর, প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য : বিদ্যাসাগর ও বেসরকারী সমাজ, স্বপন বসু : সংবাদ-সাময়িকপত্রে বিদ্যাসাগর। এছাড়াও পরিশিষ্ট অংশে আছে : বিদ্যাসাগর - ব্যালেন্টাইন বিতর্ক, বর্ণপরিচয় ও বোধোদয় সম্পর্কে জন মার্ডকের-এর রিপোর্ট, সর্বদর্শনসংগ্রহ-এর ভূমিকা, সংস্কৃত কলেজ সম্পর্কিত খসড়া, বিদ্যাসাগর - দয়ানন্দ সরস্বতী সঙ্কলন, অশোক উপাধ্যায় মশাইয়ের প্রবল পরিশ্রমলব্ধ : সাময়িকপত্রে বিদ্যাসাগর চর্চা - খসড়াপঞ্জি।

‘মুখাবয়ব’, সুলেখা সান্যাল সংখ্যা, সম্পাদক : দেবব্রত দেব, সহযোগী সম্পাদক : শ্যামল ভট্টাচার্য, এই সংখ্যার অতিথি সম্পাদক : শম্পা রায়, সোমেন সুকান্ত সরণি, কৃষ্ণনগর, আগরতলা, ত্রিপুরা এবং এন-৫৯ হেমচন্দ্র মুখার্জী রোড, বড়িশা, ৭০০০০৮, ফোন : ৯৪৩৬৪৫৯৩৫৩/ ৭০৮৫৪৩৮০৪০

১৯৯৬ থেকে প্রকাশিত হচ্ছে ‘মুখাবয়ব’। ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত লিটল ম্যাগাজিন হিসেবে দেবব্রত-শ্যামল সম্পাদিত পত্রিকাটি প্রতিনিষ্পন্নীয়। এই সংখ্যায় সুলেখা সান্যালের (১৯২৮-১৯৬২) গল্প, উপন্যাস, নারীভূবনকে বিভিন্ন দিক থেকে বুঝতে চেয়েছেন চিত্রিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুতপা ভট্টাচার্য, রামী চক্রবর্তী, শ্রুতি ঘোষাল, সীমা দাস, শম্পা রায়, পূর্ববী বসু, তপোধীর ভট্টাচার্য, রাখল দাশগুপ্ত ও মিতা দে হোমচৌধুরী। কথাসাহিত্যিক সুলেখা সান্যাল বিস্মৃতপ্রায় হলেও ‘মুখাবয়ব’ তাকে নিয়ে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ কোরে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হলেন। আশাপূর্ণা দেবী, লীলা মজুমদার, সাবিত্রী রায়, জ্যোতির্ময়ী দেবী, অঞ্জলি লাহিড়ী ও মহাশ্বেতা দেবীর



মতো সুলেখা সান্যাল-ও স্মরণীয় কথাকার। তিনিও পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারী-নিপীড়নের বিভিন্ন প্রকরণ ও অবদমিত নারীর মনস্তাত্ত্বিক বিষাদের অসামান্য নান্দনিক সন্দর্ভ নির্মাণ করেছেন। ব্লাড ক্যানসারে মাত্র চৌত্রিশ বছর বয়সে প্রয়াত হবার কারণে তার সাহিত্য-জীবন সীমাবদ্ধ ছিল ১৯৪৪ থেকে ১৯৬২ পর্যন্ত। প্রথম গল্প ‘পঙ্কতিলক’ প্রকাশিত হয় ‘অরণি’ পত্রিকায় ১৯৪৪-এ। বিএ ক্লাসের ছাত্রী হিসেবেই তিনি কমিউনিস্ট আন্দোলনে যুক্ত হন। স্বাধীনতার পর তিনি রাজনৈতিক কারণেই প্রেসিডেন্সি জেলে কারারুদ্ধ হন। জেল থেকে বিএ পাশ করেন। জেল থেকে বেড়িয়ে তিনি প্রথমে খিদিরপুরের একটি স্কুলে ও তারপরে বর্ধমানের বড়শুলের কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট প্রোজেক্টের একটি স্কুলে শিক্ষকতা করেন। তার ব্যক্তিগত জীবন সুখের ছিলনা। তিনি লিউকোমিয়ায় আক্রান্ত হন। কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে তাকে মস্কো পাঠানো হয়। সেখান থেকে ফিরে আসার পর স্বেচ্ছা-নির্বাসন তার জীবনে অমোঘ হয়ে ওঠে। ১৯৬২-তে প্রয়াত হন। তার গল্পের সংখ্যা সাঁইত্রিশ ও উপন্যাস দুটি। তার সমসময়ের সমাজ ও সংস্কৃতির গতিপ্রবাহ এবং তার সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক জীবন অবিচ্ছিন্ন। রাজনীতি তার বিশ্বাসের জমিকে শক্ত করেছিল ও সুসংগঠিত বিশ্ববীক্ষার ওপর দাঁড় করিয়েছিল।



লক ডাউনের স্থিতাবস্থা আড়কষ্টতা এনে দিয়েছে শরীরে। কিন্তু কর্মহীন এমন বন্দীদশাতেও কিছু মন ছুটে চলেছে মানবজমিন জরিপ করার কাজে। তাঁদেরই একজন মুর্শিদাবাদের বহরমপুরের কৃষ্ণজিৎ সেনগুপ্ত। লেখকের অন্তরালে শিল্পী কৃষ্ণজিৎ এমন দুর্দিনেও সেই মুখগুলোর ছবি অসামান্য দক্ষতায় স্কেচের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন যাঁরা নিরন্ন, কর্মহীন, উদ্বেগ আর যন্ত্রণার দিন কাটাচ্ছেন। লক ডাউনের মধ্যেও মুদ্রণ



আকারে না হলেও ডিজিটাল প্রেক্ষিতে তাঁদেরই জীবন-যন্ত্রণা নিয়ে একটি সাবলীল বই প্রকাশ করলেন শিল্পী কৃষ্ণজিৎ। উদ্ভাস প্রকাশনার তরফে মুদ্রিত ৮০ টাকা মূল্যের বইটির নাম 'নিরন্ন কর্মহীন'। যেখানে ৫২ পাতার বইতে চায়ের দোকানি, রাজমিস্ত্রী, রিক্সাওয়ালা, ভ্যানচালক, নাপিত, ছুতোর, কাজের মাসি, হকারদের মতই ৪২টি জীবন, তাঁদের পোর্ট্রেট ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

হয়তো বহরমপুর-সহ মুর্শিদাবাদের নানা স্টেশন চত্বরে, রাস্তার মোড়ে, স্থানু গাছের ছাওয়ায় বসে থাকা এই মুখগুলোকেই খুঁটিয়ে দেখে স্কেচ খাতায় ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক-শিল্পী। কিন্তু এমন মুখ তো এর মধ্যেই লক্ষ লক্ষ, কোটি মুখের জেরক্স হয়ে গেছে দেশের নানা রাজ্যের অচেনা মহল্লায়। ভূমিকাতেই লেখক লিখেছেন অভূতপূর্ব এক অসুখের আক্রমণে কর্মহীন, গৃহবন্দী মানুষ। স্তব্ধ দেশ। রাষ্ট্রের নির্দেশে লক ডাউন চলছে দিনের পর দিন। জানা নেই, কবে শেষ হবে এই স্তব্ধতা, কবে ফের কাজে ফিরবে মানুষ। কিন্তু চরম দুর্দশায় পড়া এই অভুক্ত মানুষগুলোর জীবনের অনিশ্চয়তা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে শিল্পীর স্কেচ পেনে।

সদর ঘাটের চায়ের দোকান সঙ্গে ঘুগনি পাউরুগটি বিক্রেতা কাশেম মণ্ডলের দোকানের ঝাঁপ বন্ধ হয়েছে ফেরিঘাট বন্ধ হওয়ার সঙ্গেই। একই সঙ্গে নৌকা-চালক সুবল মাঝিরও হালে পানি নেই। রোজ চার মাইল হেঁটে লোকের বাড়িতে কাজ করতে যাওয়া রাফিয়া খাতুনকেও এখন বাড়িতে ডাকার সাহস নেই গৃহমালিকের। মানদা দাসের ভেজে নিয়ে যাওয়া মুড়ি কিংবা ফুলমণি দাসের বাদামের এখন আর বিক্রি নেই। লক ডাউনে নাকি চাহিদা কমেছে তাই বিনোদ বাগদির হাতেও বিড়ি বাঁধার বরাত নেই। সংক্রমণের ভয়ে কাজে নিচ্ছে না বলে আয়া সেন্টারের কর্মী রুকসানা খাতুনও এখন উপার্জনহীন। মেস ফাঁকা হয়েছে লক ডাউনে, মেসবাড়িতে রান্নার মাসি পদ্মরানি



মজুর মিন্টু শেখ, ছাপাখানায় কাজ করা গ্র্যাজুয়েট বিশ্বনাথ দাস কিংবা লালগোলা প্যাসেঞ্জারের বালমুড়ি বিক্রেতা ফজল আলির জীবন এখন কতকটা একইরকম। কর্মহীন এই জীবনগুলোর যন্ত্রণা নিয়েই কৃষ্ণজিৎ সেনগুপ্তের বই 'নিরন্ন কর্মহীন'।

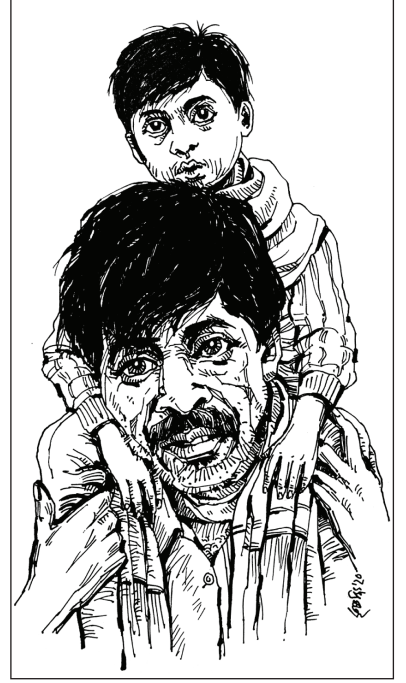
এ পর্যন্ত কৃষ্ণজিৎ সেনগুপ্তের প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা প্রায় ১৫/১৬টি। তবে শিল্পকলা নিয়েই তাঁর সমস্ত বইয়ের প্রকাশ। চিত্রশিল্পী





জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে নিয়ে কবিতা পাক্ষিক থেকে কৃষ্ণজিৎ সেনগুপ্তের বই প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও বিখ্যাত শিল্পী দেবব্রত মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে 'আগুন তুলি', শিল্পী ললিতমোহন সেনের ছাপচিত্রকলা নিয়েও 'ছায়ায় ধোয়া আলো' নামে বই প্রকাশ করেছেন কৃষ্ণজিৎ। সর্বশেষ মাস দুই আগেই গ্রামাফোন বইয়ের রেকর্ড কভার নিয়ে একটি ভালো কাজ করেছিলেন কৃষ্ণজিৎ সেনগুপ্ত। 'রেকর্ডের পোশাক' নামে এই বইটির প্রকাশ হয়েছে অবনীন্দ্র সভাগৃহে। ছবির বই শুধু নয়, শিল্পী ছবির প্রদর্শনীও করেছেন বিস্তর। তাঁর ছবির ৫টি প্রদর্শনী হয়েছে কলকাতায়। উদ্ভাস প্রকাশনা ছাড়াও এর আগে ধ্রুবপদ, কবিতা পাক্ষিক, গাওচল এই সমস্ত প্রকাশনা থেকে ওনার বই প্রকাশিত হয়েছে। ছোট থেকেই ছবি আঁকার প্রতি ঝোঁক, আর তার সঙ্গে অভ্যেসও স্কুলজীবন থেকেই।

কিন্তু স্কেচ খাতার এমন বই প্রকাশে সেই নিরম মানুষের যন্ত্রণা তুলে ধরেই কৃষ্ণজিৎ সেনগুপ্তের কাজ সারা নয়, তার সঙ্গে সেই বঞ্চিত মানুষদের কিছু যন্ত্রণা লাঘব করার চেষ্টাও জুড়ে রয়েছে তাঁর এমন উদ্যোগে। ডিজিটাল সংস্করণে বই প্রকাশকে ঘিরে সোশ্যাল মিডিয়াতেই লেখক-শিল্প একটি আবেদন জুড়ে দেন পাঠকদের উদ্দেশ্যে। বইটির জন্য অনুদান ন্যূনতম ৫০ টাকা, সর্বাধিক ৮০ টাকা সাহায্য পাঠালে দানের অর্থ সেই অংশের বঞ্চিত মানুষদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে। গত ৩০শে এপ্রিল বইটির প্রকাশ, আর তার মাত্র ৪ দিনের মাথাতেই সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে ৭০ হাজার টাকা সংগৃহীত হয়েছে। কাজও শুরু করে দিয়েছেন তাঁরা। কৃষ্ণজিৎ সেনগুপ্তের এমন কাজের সঙ্গী রয়েছেন তাঁরই বন্ধু মৃগাল নন্দী।



কোভিড-১৯ ভাইরাস সংক্রমণে ছেয়ে যাওয়া পরিধি দ্রুত বাড়ছে কলেবরে। ব্যাধি সংক্রামিত হচ্ছে শরীর থেকে সামাজিক শরীরে। সংক্রমণ এড়াতে জনজীবনের মুখ ঢাকা পড়েছে কাপড়ের মাস্ক বা মুখোশে। এমনই বেশ কিছু মুখোশের প্রতিচ্ছবি শিল্পী ফুটিয়ে তুলেছেন পেনের আঁচড়ে। স্কেচ খাতার কৈফিয়তে শিল্পী লিখেছেন খুব পরিচিত চেহারা, চেনা অভিব্যক্তি বলে মনে হতেই পারে স্কেচগুলো। তার সঙ্গেই কবুল করেছেন এই চিত্রমালায় কোন ছবছ আঁকেননি তিনি। কিন্তু শিল্পী লেখক যে মুখোশেরই ছবি আঁকুক সেই মুখোশগুলো বড়ই জীবন্ত মুখের ছবি। সর্বোচ্চির এক কঠিন সময়ে এক অভিনব উদ্যোগের নজির মিললো এই বই প্রকাশনায়।



